বাংলা গদ্যের বিবর্তন ঃ সার্ধশতবর্ষ

সুমিতা চক্রবর্তী

গদ্যের বিবর্তন বিষয়ে কিছু ভাবতে গেলে প্রথমেই একটি প্রশ্ন জাগে। এই গদ্য কি লেখ্য গদ্য? অথবা কথ্য গদ্য? এই গদ্য কি চলিত গদ্য? অথবা সাধু গদ্য? বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে এ-বিষয়ে কিছু চিন্তার অবতারণা করা যেতে পারে।

বিশ্বের সর্বত্রই কথ্য ভাষার আবির্ভাব হয়েছে আগে, লিখিত ভাষার আর্বিভাব হয়েছে তার অনেক পরে। কিন্তু আমরা কোনোদিন কোনো ভাষারই প্রাচীন কালের কথ্যরূপের সন্ধান পাব না, কারণ, প্রাচীন কালে নিজেদের মধ্যে যে-মানুষেরা কথা বলতেন তাঁরা প্রয়াত হয়েছেন অনেক বছর আগে। তাঁদের ভাষা-ভঙ্গি কেমন ছিল তা জানবার কোনো উপায় আজ আর নেই। স্বরধারক যন্ত্রের আবিষ্কার ঘটেছে সাম্প্রতিক একশো বছরের কিছু বেশি হল। সেসব যন্ত্রেও সাধারণত সাধারণ মানুষের কথোপকথন ধরে রাখা হয় না। রেকর্ড করা থাকে কবিতার আবৃত্তি, ভাষণের অংশ এবং নাটক ও চলচ্চিত্রের সংলাপ। এই ধরনের ভাষা মুখে বলা হলেও তা জনসাধাণের কথ্য সংলাপ নয়। এগুলি সচেতনভাবে বিন্যস্ত ভাষা— অনেকটা লেখ্য গদ্যেরই অনুরূপ।

ভাষার কথ্য রূপ এবং লেখ্য রূপের মধ্যে উৎসমূলেই আছে পার্থক্য। প্রয়োজনীয় ভাব-বিনিময়ের তাগিদে কথ্য ভাষার উৎপত্তি। এই ভাষা সচেতনভাবে বিন্যস্ত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত। এই ভাষায় ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলার কথা বিশেষ ভাবা হয় না। এই ভাষার শব্দ উচ্চারণ এবং শব্দের অন্বয় সাধারণত আঞ্চলিক। দক্ষিণবঙ্গের মানুষ যেখানে বলেন— 'যাবো না', সেখানে অসম এবং উত্তরবঙ্গের বহু বাঙালির কথ্য ভাষায় এই বাক্যটি হয়— 'যাইতাম না'। আবার পূর্ববঙ্গ, অর্থাৎ বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে এই বাক্যটির রূপ হবে 'যামু না'। ভাষাকে সম্পূর্ণ বাক্যে সাজিয়ে দেবার প্রয়োজনও অনেক সময় পড়ে না কথ্য গদ্যে। অসম্পূর্ণ বাক্য, একটি বা দুটি শব্দের উচ্চারণ অথবা একটি ধ্বনির উচ্চারণও কথ্য গদ্যে ভাষার বিকল্প হতে পারে। কথ্য গদ্যের ভাষার সঙ্গে মিশে থাকে কণ্ঠস্বরের ওঠাপড়া এবং শরীরী ভঙ্গি। একটি শব্দের সঙ্গে উত্তোলিত তর্জনী, মুখের ভাব এবং দৃষ্টিক্ষেপণ, হস্তপদের আন্দোলন, মাথা ও ঘাড় নাড়া মিলিত হয়ে কথ্য ভাষার জন্ম হয়। লেখ্য ভাষার থাকে না সেই স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতা। লেখ্য ভাষা সর্বদাই সচেতন, সুনিশ্চিত এবং শিল্পিত। কাজেই বাংলা গদ্যের বিবর্তন দেখাতে গেলে লেখ্য গদ্যের বিবর্তনই দেখাতে হবে, কথ্য গদ্যের বিবর্তন স্বল্প সময়ের পরিসরে কিছুটা নির্দেশ করা যায়— কিন্তু তা-ও খুবই স্থানিকতায় সীমাবদ্ধ।

কথ্য গদ্যেরও দুটি রূপ আছে— আঞ্চলিক ও মান্য। আঞ্চলিক রূপটি অঞ্চল-বিশেষে প্রচলিত থাকে, মান্য রূপটি সাধারণত হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতজনের ভাষা এবং প্রায়শই নাগরিক। কথ্য গদ্য সব সময়ই, বলা যায় প্রতি মুহূর্তেই, বিবর্তিত হতে থাকে। আঞ্চলিক কথ্য গদ্য এবং নাগরিক কথ্য গদ্য— উভয়ের ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য।

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কৃষক-পরিবারের একটি শিশু স্বগৃহে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে যে-ভাষায় কথা বলে, স্কুলে এসে ঠিক সেই ভাষা সে তার শিক্ষকদের মুখে শুনতে পায় না। যখন সে শহরের স্কুলে আসে তখন সে আরো

ভিন্ন ধরনের কথ্য গদ্যের মুখোমুখি হয়। ফলে তার ভাষা পরিবর্তিত হতে থাকে। এই জন্যই একটি গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান এবং শহরে চাকরি করতে আসা শিক্ষিত পিতার সন্তানের কথ্য গদ্য হয়ে যায় আলাদা। মান্য কথ্য গদ্য হয়ে ওঠে নগরের ভাষা, রাজধানীর ভাষা, শিক্ষিতজনের প্রতিষ্ঠানসম্মত ভাষা। সেজন্যই পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক কথ্য গদ্য ব্যবহৃত হলেও সেই বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষেরাই যখন এসে বসেন অফিসের চেয়ারে, দেখা করতে যান ওপরওয়ালার সঙ্গে, উপস্থিত হন নাগরিক সমাবেশে তখন তাঁদের ভাষা হয়ে ওঠে মান্য কথ্য বাংলা। সেজন্যই ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, দিনাজপুর, শিলচর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মানুষ নিজেদের অঞ্চলে অনেকেই আঞ্চলিক কথ্য গদ্য ব্যবহার করলেও যখন তাঁরা বেতার অথবা দূরদর্শনে কথা বলেন তখন সেই কথ্য গদ্যের যে-রূপটি আমাদের কানে ধরা পড়ে তাকেই বলতে হবে মান্য কথ্য গদ্য। সেই মান্য কথ্য গদ্যেরও প্রতিনিয়ত বির্বতন ঘটে। বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে ইংরেজি ও হিন্দি শব্দ, ভাষায় চলে আসে আধুনিক প্রযুক্তিগত শব্দাবলি আর প্রকাশভঙ্গি। পরিবর্তিত হয় উচ্চারণ।

কথ্য গদ্যের বিবর্তন অনুসরণ করা অতএব সহজ কাজ নয়। তার চেয়েও বড় কথা— একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় খুব বেশি হলে একশো বছরের কালপরিসরে সীমাবদ্ধ কথ্য গদ্যের বিবর্তনকে দেখাতে পারবেন। তা হতে পারে একটি অঞ্চলের কথ্য ভাষা অথবা মান্য কথ্য ভাষা। কথ্য বাংলা গদ্য সম্পর্কে বক্তব্য এখানেই শেষ করে লেখ্য বাংলা গদ্যের বিবর্তনের রূপরেখা এবার আমরা অনুসরণ করতে পারি। এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় লেখ্য বাংলা গদ্যের বিবর্তন। বিভিন্ন প্রামাণিক সাহিত্য-ইতিহাস গ্রন্থ এবং আমার পঠিত বাংলা সাহিত্য সম্ভার আমার অবলম্বন। লিখিত ভাষা প্রায় সর্বদাই হয় কোনো-না-কোনো পাঠক বা পাঠককুলের উদ্দেশে নির্মিত। 'নির্মিত' শব্দটি এখানে ব্যবহার করা সংগত কারণ এই ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত নয়; চিন্তা করে এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই ভাষাকে যত্ন সহকারে গড়ে তোলা হয়। সেই উদ্দেশ্য হতে পারে কোনো পত্র, কোনো দলিল, আইন-আদালতের কোনো বয়ান, ধর্মীয় উপদেশ, রাষ্ট্রনীতি অথবা চিকিৎসা-শাস্ত্রের নির্দেশ, দার্শনিক উপলব্ধির ভাষ্য, বিজ্ঞান অথবা গণিত শিক্ষার কোনো প্রণালি, সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা অথবা সাহিত্য। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লেখ্য গদ্য লিখনের বিষয়বস্তু এবং প্রত্যাশিত পাঠকদের শিক্ষা ও প্রয়োজনের মানদণ্ডে রূপায়িত হয়। এই সব দিক বিবেচনা করে তবেই লেখ্য গদ্যের বিবর্তন সম্পর্কে সন্ধানী হতে হবে।

বাংলা ভাষায় প্রথম লিখিত নিদর্শন দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যে লিখিত যে-চর্যাগীতি তার সংরূপ সুরাশ্রিত কবিতা। অতঃপর ষোড়শ শতাব্দের আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কাব্য-কবিতা ছাড়া কোনো গদ্য লিখনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কারণ দুর্লক্ষ্য নয়। ভারতের পূর্বপ্রান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে দশম শতাব্দের আগে পর্যন্ত সুচিহ্নিত কোনো রাষ্ট্রীয় সীমারেখা ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট-বড় শাসকেরা রাজত্ব করতেন। তাঁদের মাথার উপরে বৃহত্তর যে-রাজশক্তি ছিল তা মোটের ওপর দ্বাদশ শতাব্দ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মাচারী এবং ত্রয়োদশ শতাব্দ থেকে ক্রমশ সেই শাসকেরা হয়ে উঠতে লাগলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী। দ্বাদশ শতাব্দের আগে রাজকার্য, আইন-আদালত; ধর্ম, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক যা-কিছু লেখা হত তা হত সংস্কৃত ভাষায়। ত্রয়োদশ শতাব্দের পর থেকে ক্রমে সংস্কৃতের স্থান নিতে লাগল ফারসি ভাষা। দ্বাদশ শতাব্দ পর্যন্ত আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় কিছুই লেখা হত না কারণ সমাজের উচ্চবর্গীয় শিক্ষিত শ্রেণির মতে আঞ্চলিক কথ্য ভাষা ভদ্রজনের কাছে পেশ করবার মতো মর্যাদাসম্পন্ন নয়। অতএব আঞ্চলিক কথ্য ভাষা যাঁরা ব্যবহার করতেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা লিখতেন সংস্কৃতে। দরিদ্র, কায়িক শ্রমিকেরা লেখাপড়া শেখবার সুযোগই পেতেন না। ফলে বাংলা ভাষায় কিছুই লেখা হয়নি।

দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের একটি বিবর্তিত শাখায় গূঢ় অর্থব্যঞ্জক গুরুবাদী-ধর্মীয় সংগীতরূপে চর্যাপদগুলির উদ্ভব ঘটেছিল। সেই ভাষায় বাংলা, ওড়িয়া এবং অসমিয়া ভাষার একটি সংমিশ্রিত রূপ চোখে পড়ে। চর্যাপদে যদিও বাংলার ভাগই বেশি। সেই প্রথম লিখিত বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছিল খানিকটা রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধেই। বেদ-ব্রাহ্মণ-বিরোধী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে।

ত্রয়োদশ শতাব্দের পর ইসলামি শাসকদের সময়ে হিন্দু রাজাদের রাজসভা বিপন্ন হল, রাজাশ্রিত সংস্কৃত-চর্চার কেন্দ্রগুলি অনেকটাই ভেঙে পড়ল। ফলে সংস্কৃত-বাহক সাহিত্যিক-শিল্পী-গায়ক-অভিনেতারা ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এই জনসাধারণ রাজানুগৃহীত নন, যদিও রাজার প্রতি আনুগত্য না-দেখালে তাঁরা টিকে থাকতেও

পারবেন না। তবু রাজসভার এবং রাজানুগৃহীত উচ্চবর্গের প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হল না। সেখানে তখন সংস্কৃতের পরিবর্তে ফারসি ভাষায় লিখিত হচ্ছে যাবতীয় আদেশ, অনুশাসন, দলিল এবং ধর্মদর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থ। ফলে সাধারণ বাঙালি, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র বাঙালির অবলম্বন হল বাংলা ভাষা।

এই সত্য স্বীকার করতে হবে যে প্রাক্-ইসলামীয় যুগে (এই যুগটিকে সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা হয়। মোটের উপর ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত এই যুগের ব্যাপ্তি) বাংলা সাহিত্যের চর্চা ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল এবং যথেষ্ট উন্নতও হয়েছিল। ইসলামীয় শাসকেরা যতটা সংস্কৃত-বিরোধী ছিলেন ততটা বাংলা-বিরোধী ছিলেন না। বাংলার গ্রামেগঞ্জে বাংলা ভাষায় যখন কাব্যপাঠ, কীর্তন-কথকতা, যাত্রাপালা ইত্যাদির আসর বসত তখন সেখানে অনাবশ্যক কোনো নিষেধাজ্ঞা তাঁরা আরোপ করেননি। কিন্তু মধ্যযুগে বাংলাভাষায় রচিত এই সাহিত্য প্রায় সম্পূর্ণতই ছিল কাব্য-সাহিত্য। এই পর্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কবিরা বাংলাভাষায় কাব্য রচনা করতে এবং আরবি-ফারসি-হিন্দি ভাষার কাব্য থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে কোনো দ্বিধা বোধ করেননি। এই মধ্যযুগেই বহু হিন্দু বাঙালি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও বিভিন্ন কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পিছিয়ে-পড়া বর্গের মানুষ। তাঁরা বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শেখবারও চেষ্টা করেননি। এজন্যই মধ্যযুগে নিম্নবর্গীয় বাঙালি সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভেদজনিত সংকট প্রায় ছিলই না। সে-সমস্যা ছিল উচ্চবর্গের মধ্যেই।

কিন্তু মধ্যযুগে বাংলা-সাহিত্যের সমৃদ্ধ সম্ভার ছিল কাব্যভাষায় রচিত। ধর্মীয় দর্শন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, রসশাস্ত্র সবই লেখা হত পয়ার ছন্দে। কাজেই লেখ্য বাংলা গদ্যের বিবর্তনের পথরেখা উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই দৃষ্টিগোচর হয়। তার পূর্বে যা পেয়েছি তা সামান্যই।

সামান্য হলেও গবেষকেরা যে-একটি নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন তার শক্তি কিন্তু কম নয়। ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কামতার রাজা আহোমরাজকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তার শুরুটা ছিল এইরকম — "লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বিজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" পড়ামাত্রই মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে লেখার ভাষা— এত স্বচ্ছন্দ! গদ্যের লাবণ্য যে অলংকৃতিতে ততটা নয়, প্রধানত নয় ললিতমধুর কিংবা গম্ভীর শব্দঝংকারে, সহজতাই গদ্যের মাধুর্য তা যেন অনুভব করি নতুন করে। 'তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি।' এই ভাষাই একটু এদিক-ওদিক করে সাজালে যেন গান হয়ে ওঠে 'তোমার কুশলে কুশল মানি।'

এই বিচ্ছিন্ন উদাহরণটির পর ব্রিটিশ মিউজিয়াম-এর কাগজপত্রের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট গল্পের সন্ধান পেয়েছেন গবেষকেরা। সময় অষ্টাদশ শতক— "এক দেশে এক সওদাগর ছিল। সে বাণিজ্যতে গিয়াছিল। পরে তাহার জাহাজ ও নৌকাসকল ডুবিয়া গেল। একখানা তক্তা ধরিয়া সওদাগর কিনারায় উঠিল। সেই দেশে এক মায়েমানুষ জল আনিতে আসিয়াছিল। সে সওদাগরকে লইয়া আপনার বাটীতে গেল। বিস্তর সেবা করিয়া সওদাগরকে বাঁচাইলেক।" আবার মুগ্ধ হই। ভাষা যেন তরতর করে বইছে। একটি পুনরুক্তি নেই, একটু বাহুল্য কথন নেই। প্রতিটি বাক্যেই কাহিনি এক ধাপ করে এগিয়েছে। বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্য সম্পর্কে বলা হয়, বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির যথাযথ অন্বয় তিনি এমনভাবে স্থাপন করলেন যে, ভাষায় সেই শ্রুতি-সৌকর্যময় ছন্দোস্রোত বা 'রিদ্‌ম' পাওয়া গেল যার সাহায্যে ভাষা হয়ে ওঠে সাহিত্যের ভাষা। কিন্তু এই গল্পাংশটি থেকে মনে হয় বাক্যে পদের অন্বয় চমৎকারভাবে স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছিল বিদ্যাসাগরের অনেক আগেই। কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার সুনিশ্চিত অবস্থান সম্পর্কে এই লেখকের যেন কোনো সংশয়ই নেই। 'সওদাগর', 'জাহাজ', 'তক্তা', 'কিনারা', 'মায়েমানুষ' প্রভৃতি অতৎসম শব্দ ব্যবহারে সমৃদ্ধ এই ভাষা।

অষ্টাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি সময়ে লিখিত কিছু কিছু আদালতের কাজে ব্যবহৃত দলিল, চুক্তিপত্র ইত্যাদির কিছু ছিন্ন অংশ সুকুমার সেন এবং অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। কিছু চিঠিপত্রও পাওয়া গেছে। আদালতের কাগজগুলিতে ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ কিছু বেশি। হিন্দু বাঙালির লিখিত চিঠিতেও কিছু ফারসি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাংলা গদ্যের নির্মাণে ফারসি ভাষার শব্দাবলির গুরুত্ব একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক। ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকেরাই এদেশে যথাবিধি বিচারশালা বসিয়েছিলেন।

বিচারকের সরকারি পদ সৃষ্ট হয়েছিল। বিচারের সাক্ষী-সাবুদ-দলিল-দস্তাবেজ-এর প্রচলন হয়েছিল। সেজন্যই আমাদের দেশে আইন-আদালত সংক্রান্ত গদ্য লিখনে এখনও শতকরা আশি ভাগ শব্দই ফারসি। সেগুলি বাদ দিলে বাংলা গদ্য অসম্পূর্ণ থাকে।

ঠিক তেমনই, মুসলমান শাসকেরাই জমি ও ফসল সংক্রান্ত মাপজোক, জরিপ, রাজস্ব আদায়ের জন্য কৃষকের উৎপাদিত ফসলের পাওনা অংশ ঠিক করা ইত্যাদি কাজ করাতেন। ফলে জমি, ফসল, রাজস্ব সংক্রান্ত অধিকাংশ শব্দও ফারসি ভাষা থেকে গৃহীত। একটা 'ব্যবস্থা' বা 'সিস্টেম' যখন প্রচলিত হয় তখন তার আনুষঙ্গিক শব্দাবলিও নিয়ে আসে সেই সিস্টেম-এর কার্যপ্রণালি। ঠিক যে-কারণে কম্পিউটার, স্যাটেলাইট, মোবাইল সংক্রান্ত শব্দ এবং অভিব্যক্তিসমূহ ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় ঢালা যায় না। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস খেলা সংক্রান্ত শব্দগুলির বাংলা পরিভাষা হয় না। গদ্যের নির্মাণ ও বিবর্তনের মধ্যে এভাবেই ধরা যায় কাল-প্রগতি, রাজনৈতিক শাসন ও সমাজ-পরিবর্তনের স্বাক্ষর।

বাংলা গদ্যে পাশ্চাত্য ভাষার বাগ্‌ভঙ্গি প্রথম প্রবেশ করেছিল পশ্চিমি বণিকদের আগমনের সঙ্গে। তবে বণিকদের সঙ্গে বাঙালির ভাব ও বক্তব্যের আদান-প্রদান ছিল প্রধানত মৌখিক। লেখার প্রয়োজন প্রথম অনুভব করেছিলেন পাদ্রিরা। গ্রামে গ্রামে গির্জা বানিয়ে এদেশীয়দের খ্রিষ্টান করতে গিয়ে বাংলা ভাষা জানবার প্রয়োজন অনুভব করে তাঁরা অনেকেই বাংলা ভাষা শিখলেন। তখনও পলাশির যুদ্ধ হয়নি। বাংলায় স্থাপিত হয়নি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অগ্রাধিকার। তখন পোর্তুগিজ পাদ্রিরা ছিলেন বেশি সক্রিয়। মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও-এর নাম সুবিদিত। এই খাঁটি পোর্তুগিজ পাদ্রি সাহেব নিজের বিবেচনা অনুযায়ী বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেছিলেন। তখনও বাঙালি পণ্ডিতেরা বাংলাকে 'ছোটলোকের ভাষা' বলেই গণ্য করতেন। তাঁর ক্যাথলিক তত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তিকা 'ক্রেপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' পোর্তুগাল-এর লিসবন নগর থেকে ছাপা হয়েছিল রোমান হরফে। বাংলা হরফে রূপান্তরিত করে তার একটি নমুনা দেওয়া গেল—

"সেভিলা শুহরে এক গৃহস্থ আছিল, তার নাম সিরিলো, সেই সিরিলো কেবল এক পুত্রো জর্মাইল; তাহারে এতো দয়া করিল যে কোনো দিন তাহারে শিক্ষাও না দিল এবং শাস্তিও না দিল; সে যাহা করিতে চাহিত, তাহা করিত।"

ইউরোপীয় পদবিন্যাসের ছাঁদ থাকলেও এই ভাষা স্বচ্ছন্দ ও বোধগম্য। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৭৩৩ এবং মুদ্রণকাল ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ। এখান থেকে বোঝা যায়— লেখ্য বাংলা গদ্যের প্রাচীন ও স্বাভাবিক আদর্শ ছিল সাধু বাংলা। মধ্যযুগের যাবতীয় পদ্যবন্ধে রচিত আখ্যান—ব্রত, পাঁচালি, মঙ্গলকাব্য, জীবনীকাব্য সবই সাধু বাংলায় রচিত। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের কাঠামো আর অন্ত্যমিল তুলে দিলেই বিবৃতিমূলক গদ্যের চেহারা পেয়ে যায় সেই ভাষা। এজন্যই দীর্ঘকাল লেখ্য গদ্য বাংলা ভাষার সাধু রূপটিকেই স্বীকার করে নিয়েছিল। এই অভ্যাসের সার্বিক পরিবর্তন এসেছে ১৯৫০-এর পর। এমন-কি চিঠিপত্রও ১৯২৫-৩০ পর্যন্ত লেখা হত সাধু গদ্যেই।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যের আর এক লেখক ছিলেন দোম আন্তোনিও। জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গের কোনো রাজা উপাধিধারী জমিদারের পুত্র। শৈশবে অপহৃত হয়ে পোর্তুগিজ মিশনারিদের আশ্রয়ে গিয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁকে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি রোমান হরফে একটি বাংলা বই লিখেছিলেন। বইটির সম্পূর্ণ নাম— 'জনৈক খ্রীষ্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈকব্রাহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্যের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার।' এটিও ১৭৪০-৪২-এ লেখা হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। বইটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, মুদ্রিত সংস্করণ নয়। পরবর্তী কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটি মুদ্রিত হয়েছিল। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থ সংকলন'-এর প্রথম খণ্ডে বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে অবজ্ঞা করা হয়েছে, আপত্তিকর ভাষায় আক্রমণও করা হয়েছে। তবে তাঁর বাংলা ভাষা দুর্বোধ্য বা আড়ষ্ট নয়। দৃষ্টান্ত—

"বলি বড়ো ধর্মষ্ঠ ছিলো যে যাহারে চাহিত, তাহারে তাহা দিতো এ কারণে পরমেশ্বর ব্রাহ্মণ রূপে হইয়া একপদ দিয়া পৃথিবীতে, একপদ পাতালে, আর পদ স্বর্গে, এইরূপে বলিরাজারে ছলিলেন।"

অষ্টাদশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে, পলাশির যুদ্ধের পর, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে যখন অধিকার বিস্তার করতে শুরু করেছে তখন দেশীয় ভাষায় আইনকানুন লেখবার প্রয়োজন হল। শাসন ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়াও হল আবশ্যিক। কোম্পানির কর্মচারীরাই নিয়মিতভাবে কাজের গদ্য

লেখবার প্রক্রিয়া শুরু করলেন। বাংলা হরফ তখন তৈরি হয়েছে সবেমাত্র। এ-কাজের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন চার্লস উইলকিন্স নামের এক কোম্পানি-কর্মচারী। তাঁরই পরিকল্পনায় ও উৎসাহে পঞ্চানন কর্মকার নামক এক ধাতুকর্মী ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ধাতু নির্মিত বাংলা হরফ নির্মাণ করেছিলেন। সেই হরফের প্রথম ব্যবহার ঘটল ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী হ্যালহেড সাহেব লিখলেন 'আ গ্রামার অব্ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ'। এই গ্রন্থে বাংলা গদ্যের নিদর্শন সেভাবে পাওয়া যাবে না। ব্যাকরণের বই। কেবল উদাহরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বঙ্গীয় বর্ণমালা।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা হরফে বাংলা গদ্যের বিস্তৃততর লেখমালা আবির্ভূত হল শাসনব্যবস্থার পথ অনুসরণে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে-আইনকানুন প্রণয়ন করেছিল তার বাংলা অনুবাদ হতে লাগল। এরকম দুটি অনূদিত বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হল।

১) বইটির নাম 'রেগুলেশন্স ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব্ জাস্টিস ইন দ্য কোর্টস অব্ দেওয়ানি আদালত'। বাংলা অনুবাদ করেছেন জোনাথন ডানকান। ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয় ১৭৮৪-তে এবং কলকাতা থেকে ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে।

"মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণধারা ও নিয়ম—

"শ্রীযুত বড়সাহেব ও কৌসলের সাহেবলোক বিচারের যে নিয়ম ও ধারা ইঙ্গরেজি ১৭৭২ সনের ২১ আগস্ত মাসে বাঙ্গলা ১১৭৯ সনের ৮ ভাদ্রে নিরুপণ করিয়াছিলেন তাহাতে পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ঢাকা ও দিনাজপুর কিম্বা পুরনিয়া ও বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই সকল স্থানেতে মপস্বলের দেওয়ানি আদালতের ও সহর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচহরি স্থৈর্য্য হইয়াছিল তাহার পর ইস্তক ১৭৭৪ সন লাগায়দ ১৭৭৯ সন ইঙ্গরেজি সেই সদর আদালত স্থগিত ছিল পরে ১৭৮০ সনে শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌসলি সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনশ্চ স্থৈর্য্য হইল কিন্তু শ্রীযুত বড় সাহেব ও কৌসলি সাহেবলোক অনবকাস জন্যে কখন সেই সদর আদালতে বসিতে পারেণ নাই।"

২) দ্বিতীয় বইটির নাম 'কর্ণওয়ালিস কোড'। বইটি সেই সময়ে প্রচলিত আইনগুলির একটি সংকলন। সংকলক ছিলেন হেনরি পিট্স ফর্স্টার। অনুবাদ অবশ্য তাঁর করা নয়। অনুবাদকের নাম অনুল্লেখিত। বইটির প্রকাশকাল ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ। গদ্যের দৃষ্টান্ত—

"শ্রীযুক্ত কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকার বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট মর্যাদা ও নানাবিধ দ্রব্য জন্মান ও প্রস্তুত কারণ যে সকল সামগ্রী চাহি তাহার উৎপত্য ভূমি হইতেই হয় অতএব বিক্ষাত গাছে যে চাসকর্মের আধিক্যে মহাজনি দ্রব্যাদি অনেক জন্মে ও তৎসহজোগে দেশের সম্পত্য ও বিস্তর হইতে পারে কিন্তু চাসকর্মের আধিক্যানুসারে এদেশে যে সকল নাভ দর্শে তাহা কেবল মহাজনি বিসএ পর্যাবসান নহে এই হেতুক জে এদেষে অন্য ২ জাতি অপেক্ষা হিন্দুজাতি বিস্তর লোক আছে তাহার দির্গ্যের ব্যবহার ও আহারের তাৎপর্য্য অর্থাৎ দিনপাতের ভরসা ভূমির উৎপত্য সামিগ্রতেই বর্ত্তে এবং হিন্দু ছাড়া অপর ক্ষুদ্র লোকেও দেসাচার ও অসঙ্গতি কারণ আপনার দির্গের কালহরণের আশা ভূমির উৎপত্যের উপরেই রাখে এমত দর্শন হইতেছে ইহাতে মধ্যে ২ অনাবৃষ্টিতে সুকা কি মরা অতিবৃষ্টিতে জলগণ্ড হাজা হইলে ভূষা জিনিস অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রীর উৎপত্যের হানি হইলে নিতান্তই দুর্ভক্ষ হইয়া যাবদিয় চাসি ও সিল্পকার্য এতাবতা কারিগর লোক জাহারদিগের শ্রম ও প্রাণপর্ণে বিষয়ী লোকদিগের বল ও সম্পত্যলাভ হয় তাহারা অন্য ২ লোকাপেক্ষা অতিসয় আপদগ্রস্থ হয় এবং সমূহ দুঃখ পায়।"

উদ্ধৃত দুটি গদ্যাংশ থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। প্রথমত, বাংলা লিখিত অংশের টানা গদ্য লিখনে যতিচিহ্নের নিতান্তই অভাব।

দ্বিতীয়ত, ইংরেজদের লেখা বাংলা গদ্যে— সদর, দেওয়ানি, আদালত, সাহেব, কচহরি, ইস্তক, লাগায়দ, বাহাদুর, কারিগর ইত্যাদি ফারসি শব্দের মসৃণ অনুপ্রবেশ।

তৃতীয়ত, গদ্যাংশ দুটির অর্থ বোঝা গেলেও লিখনদুটিকে স্বচ্ছন্দ ও শ্রুতিনন্দন বলা যায় না। এই গদ্যে সাহিত্যগুণের কোনো ব্যঞ্জনা নেই। অবশ্য তা থাকবার কথাও নয়।

এর পরেই প্রতিষ্ঠিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান। কাজেই বাংলা গদ্যের চর্চায় দেখা দিল সবল অগ্রগতি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পর্বের তিনজন গদ্যশিল্পীর নামই বাংলা গদ্যের চলনে বৈচিত্র্য সঞ্চার, উৎকর্ষ সাধন এবং পদান্বয়ের কাঠামো

দাঁড় করিয়ে দেবার কৃতিত্বের জন্য স্মরণযোগ্য। তাঁরা হলেন উইলিয়ম কেরি, রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

উলিয়াম কেরি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে, ইংল্যান্ডে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। একসময় চামড়ার কাজও করেছিলেন। কিন্তু প্রখর মেধাবী এবং ভাষাশিক্ষায় বিশেষভাবে আগ্রহী উইলিয়াম কেরি যৌবনে ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করে ভারতে আসেন। তিনি ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ব্যান্ডেল, নদিয়া, সুন্দরবন, মালদহ, শ্রীরামপুর ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করেন। মুনশি রামরাম বসুর কাছ থেকে শেখেন বাংলা। বাইবেল অনুবাদের কাজ করতে গিয়ে নিজের সুবিধার জন্য রচনা করেন একটি ব্যাকরণ এবং সংকলন করেন সংক্ষিপ্ত একটি শব্দকোশ। আরো কয়েকজন ধর্ম-প্রচারকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কেরি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুর মিশন। সেখান থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মথী রচিত মিশন সমাচার'। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বই। এই বইয়ের অনুবাদ করেছিলেন টমাস নামক একজন সাহেব এবং রামরাম বসু। কেরি এই অনুবাদের ভাষা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। এই বইয়ের বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল—

"তাহার পর মঙ্গল সমাচার তর্জমা হইল উরাবী আরবী আরমানি লাতিন ইতালী ফ্রাঁসি ওলেন্দাজী জার্মানি ইঙ্গরিজি ফরিঙ্গি সুএদী রূসী দানিমার্কি ওএলচ্ প্রুসী সুইসি অঙ্গারি বোহেমি এবং আর অনেক ভাসায় যাহা এখন মনে পড়ে না।

"মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত আছে ধর্মগ্রন্থের অতি ক্ষুদ্র ভাগ আর সমস্ত তর্জমা হইয়াছে এবং শীঘ্র প্রকাশ হইবে। চাপাইতে ২ বুঝি বৎসর দুই তিনেক গৌণ হইবে কিন্তু তাহার মধ্যে আর কতক ২ প্রকাশ করিব।"

এই ভাষাকে স্বচ্ছন্দ গদ্যের নিদর্শন বলা যায় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কেরি ভারতীয় ছিলেন না। ভারতীয় ভাষা তথা বাংলা ভাষার বাগ্‌ভঙ্গি তাঁর পক্ষে সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু রামরাম বসু যদি অনুবাদের মূল অংশটি করে থাকেন তাহলে তাঁর ভাষা হওয়া উচিত ছিল আরো সাবলীল। মনে হয়, অনুবাদের বিষয়বস্তু এবং উৎস-ভাষা (source language) রামরাম বসুর অপরিচিত হওয়াতে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাংলা বাক্য নির্মাণ করতে পারেননি।

এরপরেই উইলিয়াম কেরি এমন একটি কাজ করেন যাঁর জন্য তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাতে হয়। তিনি সাধারণ মানুষের কথ্য বাংলাকে লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'কথোপকথন' গ্রন্থে।

সেই ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে কথ্য চলিত মৌখিক ভাষাকে বাংলা ভাষা চর্চার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি যা তার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও বাঙালি বিদ্বান পণ্ডিতেরা সমর্থনযোগ্য মনে করেননি। 'কথোপকথন' থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত হল।

'স্ত্রীলোকে ২ কথাবার্তা'—

১মা— ওলো, তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে বল শুনি।

২য়া— আহা, তাহার কথা কহ কেন? এখন আর আমাদের কি আদর আছে? নূতনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুরাণের দিকে কে চাহে?

১মা—তাহা হউক। তুই সকলের বড়, তোর ছাল্যাপিল্যা হইয়াছে।

২য়া— কালিকে ভাই দুপুরবেলা কচকচি লাগালে মাঝ্য বিটি তাহা কি বলিব।

১মা— কিজন্য কচকচি হইল?

২য়া— দূর কর ভাই, তাহা কহিলে আর কি হবে, লোক শুনিলে মন্দ বলিবে। আমার বাড়ী শত্রু ভরা, এই জন্য ভয় করি।

কোনো কোনো গবেষক সংগতভাবেই মনে করেছেন সাধু বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হলেও এই অংশে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে— যেমন ভাতার, ছাল্যাপিল্যা, কচকচি তা সাহেব কেরি-র দ্বারা সরাসরি গ্রামের মেয়েদের মুখ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্যই দেশীয় সংগ্রাহকদের সহায়তা নিয়েছিলেন। এই সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে, তবু বলতেই হবে যে এই পরিকল্পনাটি করবার জন্যই উইলিয়াম কেরি আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষাশিল্পী।

এই সূত্রেই কেরি রচিত পরবর্তী গ্রন্থটির গদ্য ভাষার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যদিও কেরি-র 'ইতিহাসমালা' বইটির প্রকাশকাল ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ, কিন্তু এই উদ্ধৃতির সঙ্গে কেরি-র প্রসঙ্গ আমরা এখানে শেষ করতে পারব। 'ইতিহাসমালা' বইটি অবশ্য ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন নয়। বাংলায় প্রচলিত পুরাণ, ব্রত-পাঁচালি-কাব্যের কাহিনি এবং লোকগল্পের সংকলন হল 'ইতিহাসমালা'। সেখান থেকে একটি লোকগল্পের ভাষার উদাহরণ

দাঁড় করিয়ে দেবার কৃতিত্বের জন্য স্মরণযোগ্য। তাঁরা হলেন উইলিয়ম কেরি, রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

উলিয়াম কেরি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে, ইংল্যান্ডে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। একসময় চামড়ার কাজও করেছিলেন। কিন্তু প্রখর মেধাবী এবং ভাষাশিক্ষায় বিশেষভাবে আগ্রহী উইলিয়াম কেরি যৌবনে ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করে ভারতে আসেন। তিনি ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ব্যান্ডেল, নদিয়া, সুন্দরবন, মালদহ, শ্রীরামপুর ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করেন। মুনশি রামরাম বসুর কাছ থেকে শেখেন বাংলা। বাইবেল অনুবাদের কাজ করতে গিয়ে নিজের সুবিধার জন্য রচনা করেন একটি ব্যাকরণ এবং সংকলন করেন সংক্ষিপ্ত একটি শব্দকোশ। আরো কয়েকজন ধর্ম-প্রচারকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কেরি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুর মিশন। সেখান থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মথী রচিত মিশন সমাচার'। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বই। এই বইয়ের অনুবাদ করেছিলেন টমাস নামক একজন সাহেব এবং রামরাম বসু। কেরি এই অনুবাদের ভাষা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। এই বইয়ের বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল—

"তাহার পর মঙ্গল সমাচার তর্জমা হইল উরাবী আরবী আরমানি লাতিন ইতালী ফ্রাঁসি ওলেন্দাজী জার্মানি ইঙ্গরিজি ফরিঙ্গি সুএদী রূসী দানিমার্কি ওএলচ্ প্রুসী সুইসি অঙ্গারি বোহেমি এবং আর অনেক ভাসায় যাহা এখন মনে পড়ে না।

"মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত আছে ধর্মগ্রন্থের অতি ক্ষুদ্র ভাগ আর সমস্ত তর্জমা হইয়াছে এবং শীঘ্র প্রকাশ হইবে। চাপাইতে ২ বুঝি বৎসর দুই তিনেক গৌণ হইবে কিন্তু তাহার মধ্যে আর কতক ২ প্রকাশ করিব।"

এই ভাষাকে স্বচ্ছন্দ গদ্যের নিদর্শন বলা যায় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কেরি ভারতীয় ছিলেন না। ভারতীয় ভাষা তথা বাংলা ভাষার বাগ্‌ভঙ্গি তাঁর পক্ষে সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু রামরাম বসু যদি অনুবাদের মূল অংশটি করে থাকেন তাহলে তাঁর ভাষা হওয়া উচিত ছিল আরো সাবলীল। মনে হয়, অনুবাদের বিষয়বস্তু এবং উৎস-ভাষা (source language) রামরাম বসুর অপরিচিত হওয়াতে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাংলা বাক্য নির্মাণ করতে পারেননি।

এরপরেই উইলিয়াম কেরি এমন একটি কাজ করেন যাঁর জন্য তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাতে হয়। তিনি সাধারণ মানুষের কথ্য বাংলাকে লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'কথোপকথন' গ্রন্থে।

সেই ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে কথ্য চলিত মৌখিক ভাষাকে বাংলা ভাষা চর্চার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি যা তার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও বাঙালি বিদ্বান পণ্ডিতেরা সমর্থনযোগ্য মনে করেননি। 'কথোপকথন' থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত হল।

'স্ত্রীলোকে ২ কথাবার্তা'—

১মা— ওলো, তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে বল শুনি।

২য়া— আহা, তাহার কথা কহ কেন? এখন আর আমাদের কি আদর আছে? নূতনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুরাণের দিকে কে চাহে?

১মা—তাহা হউক। তুই সকলের বড়, তোর ছাল্যাপিল্যা হইয়াছে।

২য়া— কালিকে ভাই দুপুরবেলা কচকচি লাগালে মাঝ্য বিটি তাহা কি বলিব।

১মা— কিজন্য কচকচি হইল?

২য়া— দূর কর ভাই, তাহা কহিলে আর কি হবে, লোক শুনিলে মন্দ বলিবে। আমার বাড়ী শত্রু ভরা, এই জন্য ভয় করি।

কোনো কোনো গবেষক সংগতভাবেই মনে করেছেন সাধু বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হলেও এই অংশে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে— যেমন ভাতার, ছাল্যাপিল্যা, কচকচি তা সাহেব কেরি-র দ্বারা সরাসরি গ্রামের মেয়েদের মুখ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্যই দেশীয় সংগ্রাহকদের সহায়তা নিয়েছিলেন। এই সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে, তবু বলতেই হবে যে এই পরিকল্পনাটি করবার জন্যই উইলিয়াম কেরি আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষাশিল্পী।

এই সূত্রেই কেরি রচিত পরবর্তী গ্রন্থটির গদ্য ভাষার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যদিও কেরি-র 'ইতিহাসমালা' বইটির প্রকাশকাল ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ, কিন্তু এই উদ্ধৃতির সঙ্গে কেরি-র প্রসঙ্গ আমরা এখানে শেষ করতে পারব। 'ইতিহাসমালা' বইটি অবশ্য ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন নয়। বাংলায় প্রচলিত পুরাণ, ব্রত-পাঁচালি-কাব্যের কাহিনি এবং লোকগল্পের সংকলন হল 'ইতিহাসমালা'। সেখান থেকে একটি লোকগল্পের ভাষার উদাহরণ

প্রদত্ত হল—

"একজন ঘটক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিবাহের যোজক এক বনের মধ্য দিয়া আসিতেছিল। সে স্থানে এক ব্যাঘ্র ঐ ঘটক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র ঘটকের ক্রন্দন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক, তুমি কি কারণ কাঁদিতেছ? ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি ঘটক, বিবাহের যোজকতা করিয়া ধনোপার্জন করিয়া স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির ভরণপোষণ করি। আমি মরিলে তাহারা কোনোমতে বাঁচিবেক না। ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র বিবেচনা করিল, আমি ব্যাঘ্রীহীন, ব্রাহ্মণ বিবাহের যোজকতা করে। পরে কহিলেক, হে ঘটক, তুমি আমার বিবাহ দেও— ব্যাঘ্রী না থাকাতে আমি বড় দুঃখে আছি। তুমি আমার বিবাহ দিলে আমি তোমাকে নষ্ট করিব না।"

আবারও কিছুটা সংশয় জাগে। এত সরল, স্বচ্ছন্দ, গতিশীল, সুবদ্ধ ভাষা সত্যিই কি সেই সাহেবের হওয়া সম্ভব? সম্ভবত উইলিয়াম কেরি তাঁর অপর দুই সহযোগী লেখক রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাহায্য নিয়েছিলেন। যদি তা হয়েও থাকে তাহলে একথা আমরা বলতেই পারি যে ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দেই স্বচ্ছন্দ বাংলা সাধু লেখ্য গদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের তখনও জন্মই হয়নি। আরো লক্ষণীয় যে 'ইতিহাসমালা'-র উদ্ধৃত গদ্যাংশটিতে পূর্ণচ্ছেদ, কমা, জিজ্ঞাসার চিহ্ন, ড্যাশ ইত্যাদি যতি-চিহ্নের প্রয়োগ আছে। বিদ্যাসাগরের গদ্যের অনেক আগেই বাংলা গদ্যে যতিচিহ্নও ব্যবহৃত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক কালক্রমের দিক থেকে রামরাম বসুর দুটি গদ্যগ্রন্থ— 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২) উল্লেখযোগ্য। প্রথম বইটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্য রচনা। কিন্তু এই গ্রন্থের গদ্যে দেখা যায় রামরাম বসু অতিরিক্ত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। মনে রাখতে হবে, মুসলমান শাসকদের আমলে আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলা লেখার রীতি ছিল যথেষ্ট প্রচলিত। তখনও লেখ্য বাংলা গদ্যের গঠনে সংস্কৃত শব্দ বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হবে অথবা আরবি-ফারসি শব্দ তা নিয়ে দ্বিধা ছিল লেখকদের মধ্যে। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থের গদ্যে ফারসি মিশ্রিত বাংলা লিখন-রীতির উদাহরণ পাই।

"হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল, আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর ২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত হইল; দিল্লীর কর ও শওগত এককালিন বন্দি করিয়া আপন অধিকার তিন সুবা উৎপন্নীর ধন দিয়া সৈন্য প্রচুর রাখিয়া থানাজাতে মুরচাবন্দি করিল; হুকুম হইলে কর্জকার্য করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে।"

ক্রমশই বাংলা লেখ্য গদ্যে ফারসি শব্দের প্রয়োগ কমে আসতে লাগল। তার একটা কারণ হতে পারে উইলিয়াম কেরির ভাষা-চিন্তা। তিনি বাংলা গদ্যে ফারসি শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। রামরাম বসু রচিত ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'লিপিমালা' গ্রন্থটির গদ্যে ফারসি শব্দের প্রয়োগ অনেক কম। যেমন—

"এ অধিকারে রামগোপাল সরদার বলিয়া একজন দস্যু ছিল তাহার বিবরণ দেশাধিপ পর্যন্ত প্রকাশ হইলে রাজধানী হইতে তাহাকে ধরিতে থানাদার আসিয়াছে। সে দস্যু এখন কোন্ দেশে তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার নিমিত্ত সকলে ব্যস্ত, ঈশ্বরেচ্ছায় কি হয় বলা যায় না।"

উনিশ শতকের প্রথম দশকে এবং দ্বিতীয় দশকে যে-বাংলা গদ্য প্রতিষ্ঠিত হল সেই গদ্যের প্রধান শিল্পী ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি কেরির অন্যতম সহায়ক এবং প্রিয়পাত্র ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা করতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিতে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক পদবিন্যাসের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তিনি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধিকাংশ লেখাই ছিল ফরমায়েশি। তবু ফরমায়েশি লেখাতেও কোনো স্বভাব-শিল্পী নিজের সৌষম্যবোধ ও সৃজনশীলতা উজাড় করে দিতে পারেন। সম্পূর্ণ লেখাটিতে যদি না-ও হয় অংশত তিনি তাঁর রচনার ভাষাকে করে তুলতে পারেন সাহিত্য। তেমনই পেরেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তাঁর প্রণীত 'রাজাবলি' গ্রন্থটি বিভিন্ন রাজবংশের ও রাজাদের ইতিহাস। সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থের আদর্শ থাকা সত্ত্বেও (সে-গ্রন্থ অবশ্য পাওয়া যায়নি) মৃত্যুঞ্জয় এই বইটিতে খানিকটা নিজস্ব লিখনরীতির পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে কোম্পানির শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত রাজবংশগুলির ইতিহাস প্রণয়ন করতে মৃত্যুঞ্জয়ের খুবই ভালো লেগেছিল মনে হয়। ইতিহাসের বর্ণময় এবং উচ্চাবচ গতিপথের অনুসরণে এক জীবন-নিষ্ঠ ও দার্শনিকতা-সমৃদ্ধ উপলব্ধিকে তিনি 'রাজাবলি'-তে রূপ দিয়েছেন। এই কাজটি

তাঁর কাছে ফরমায়েশি রচনার চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছিল। ভাষার দিক থেকে হয়ে উঠেছিল এক মৌলিক শিল্প-নির্মাণ। ইতিহাসের উপাদান তিনি যেখান থেকেই গ্রহণ করুন, ভাষাটি ছিল তাঁর নিজেরই। যেসব অংশের ভাষা রচনায় তিনি সবচেয়ে সার্থক হয়েছিলেন তার একটির উদাহরণ— "যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধ প্রকার রত্নলঙ্কারধারীরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিত সর্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারী রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজাদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং ঊর্দ্ধবাহু হইল।" এই ভাষা আমাদের বিস্মিত করে। এ-ভাষায় বঙ্কিমের ভাষার আদল। অথচ সময়টি ১৮০৮— বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসের অর্ধশতকেরও বেশি আগে।

এর পরেই বাংলা গদ্যরীতিতে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর বহুবিধ অসামান্য কীর্তির মধ্যে বাংলা ভাষার নির্মাণ অন্যতম। সাহিত্য সৃষ্টি করবার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি। কলম ধরেছিলেন ধর্মীয় সংস্কার এবং সমাজ সংস্কারের পক্ষে শিক্ষিত বাঙালির মনকে আকৃষ্ট করবার জন্য। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি ১৮১৫ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে প্রকাশিত। যেসব গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন সেই সম্ভারে আছে—

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের মধ্যে 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্ত সার' (১৮১৫), উপনিষদের অনুবাদ (১৮১৫-১৯) এবং বিতর্কমূলক রচনার মধ্যে 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৮), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নির্বর্তক সম্বাদ' (১৮১৮-১৮১৯), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩), 'সহমরণ বিষয়ক' (১৮২৩)। এ ছাড়াও তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩), 'ব্রহ্মসঙ্গীত' (১৮২৮), 'সম্বাদ কৌমুদী' (পত্রিকা) প্রভৃতিও রচনা করে বিচিত্র ও ব্যাপক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা গদ্যে রামমোহনের দান সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষেপে অত্যন্ত যথাযথ আলোচনা করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের 'বাংলা গদ্যের আদি পর্ব' অধ্যায়ে। তাঁর ভাষাতেই বিষয়টি বুঝে নিতে পারি—

"রামমোহন সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন হিসেবে গড়ে তুললেন। কি করে বাংলা গদ্য লিখতে-পড়তে হয় তাও যেন বাঙালি জাতির হাত ধরে শেখালেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠী বাংলা গদ্যকে কাহিনী ও গালগল্প প্রকাশের বাহন করেছিলেন, আর রামমোহন তাকে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় সজ্জিত করে আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করে তুললেন। তাঁর গদ্য তাই ঋজুগতি, তীক্ষ্ণ ও যৌক্তিক পারম্পর্যে সুগঠিত। আধুনিক মনের জটিলতাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে আধুনিক ভাষা-বাহন প্রয়োজন— রামমোহন সেই আধুনিক ভাবপ্রকাশক বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টারূপে চিরদিন অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।"

রামমোহনের লেখা থেকে দুটি অংশ উদ্ধৃত হল—

১. বিবৃতিমূলক রীতি— "ন্যায় শাস্ত্র দোষ দেন যে, ঈশ্বর এক ও জীব নানা। দুই অবিনাশী, ইহা ন্যায় শাস্ত্রে কহেন। আর দিক কাল আকাশ অণু ইহারা নিত্য ও সমবায় সম্বন্ধে কৃতি ঈশ্বরের কাছে। জীবের কর্মানুসারে ফলদাতা এবং নিত্য ইচ্ছা বিশিষ্ট ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে ঈশ্বরের কৃতিতে ব্যাঘাত হয়, কেন না তেঁহ অস্মদাদির ন্যায় দ্রব্য-সংযোগে কর্তা হইলেন।" (ব্রাহ্মণ সেবধি)

২. বিতর্কমূলক রীতি— "স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ)

রামমোহনের পর স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাসাগরের নাম এসে যায়। তিনি প্রথম গদ্য লেখন শুরু করেছিলেন বিভিন্ন ধরনের অনুবাদে। সেই অনুবাদের কালপর্ব ছিল ১৮৪৭-১৮৪৯। তারপর পাঠ্যগ্রন্থ (অনুবাদ ও মৌলিক) লিখলেন ১৮৫১-তে। ১৮৫৪ থেকে শুরু করে ১৮৯১ পর্যন্ত সাঁইত্রিশ বছর ধরে বিচিত্র ধরনের বিষয় অবলম্বনে বাংলা গদ্যের বহুরূপ বিকশিত হল তাঁর লেখার ভাষায়। তার মধ্যে ছিল শকুন্তলা ও সীতার বনবাসের মতো

ধ্বনিঝংকৃত সাহিত্যিক গদ্য; ছিল বিতর্কমূলক ব্যঙ্গসরস তির্যক গদ্য এবং হৃদয়ের ভাবাবেগ প্রকাশক ব্যক্তিগত গদ্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ আমরা শেষ করব কারণ শিক্ষিত বাঙালি মাত্রই তাঁর গদ্যের সঙ্গে পরিচিত। উদ্ধৃতিগুলি থেকে দেখা যাবে বিভিন্ন ভাব জ্ঞাপক বিবৃতিমূলক গদ্যের গাম্ভীর্য এবং একান্ত চলিত কথ্য ভঙ্গির সজীবতা কত অনায়সে তিনি সঞ্চারিত করতে পারতেন। তৎসম, তদ্‌ভব, দেশী, বিদেশী এবং একান্ত চলিত শব্দ— সবই তিনি আশ্চর্য দক্ষতায় সমন্বয়িত করেছিলেন।

১. "একে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি, সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা; তাহাতে আবার ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল; আর ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্র উপস্থিত হইল না।" (বেতাল পঞ্চবিংশতি)

২. "লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।" (সীতার বনবাস)

৩. "একথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি ভাই, তুমি যথার্থই পাগল হয়েছ, নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে। ছি ছি! কি লজ্জার কথা; আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। তিনি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন।" (ভ্রান্তিবিলাস)

৪. "এত বুদ্ধি না ধরিলে, খুড় আমার এত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। হতভাগার বেটা, কি শুভক্ষণেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই পৃথিবীতে অনেকের বুদ্ধি আছে; কিন্তু খুড়র মত খোশখৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করে, খুড়র আপদ-বালাই লইয়া এই দণ্ডে মরিয়া যাই; খুড় আমার অজর, অমর হইয়া চিরকাল থাকুন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এই সময় খুড়র কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক; আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে সেটা বিষম টোকো ও পোকাখেকো।" (আবার অতি অল্প হইল)

বিদ্যাসাগরের গদ্যলিখনের সচলতার কালপর্বের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখে লেখ্য সাধু বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্যের এক বিরল শিখরে স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র লেখা শুরু করবার আগেই লেখ্য সাধুভাষার এই প্রতিষ্ঠার যুগেই কথ্য চলিত গদ্যকে লেখার জগতে প্রবেশাধিকার দেবার একটি দাবি অনুচ্চারিতভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকেই। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' লেখা হয়েছিল ১৮৫৪-তে (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৫৮)। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে। তখনও প্রকাশিত হয়নি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। কথ্য ভাষার ছাঁদ, আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ, সর্বশ্রেণির প্রচলিত শব্দ-ব্যবহারের স্বাধীনতা, নিবিড় পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রাপ্ত অনুপুঙ্খ চিত্রময় বিবরণ, ক্ষুরধার বিদ্রুপ, রসময় রসিকতা— এই সবই প্যারীচাঁদ এবং কালীপ্রসন্ন এনে দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের ভাষায়। 'লেখ্য চলিত' ভাষার সাহিত্যস্বীকৃতি সেই প্রথম।

আরো একটি উৎসের কথা মনে রাখা দরকার। 'দুর্গেশনন্দিনী'-র আগেই লেখা হয়েছিল কয়েকটি বাংলা নাটক। ১৮৫৮-তে প্রকাশিত মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা', ১৮৬১-তে প্রকাশিত তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের সংলাপ অংশে কথ্য বাংলার সাবলীল প্রয়োগ আমাদের মুগ্ধ করে—"রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই পড়তে হয়। শর্ম্মা আপন কর্ম্মটি ভোলেন না। এই ত আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্য যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেটা হাত কত্যে হবে; আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না।" (কৃষ্ণকুমারী)।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে অনেক কিছুর জন্য স্মরণীয়। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনার জৌলুসে চাপা পড়ে যায় আর সব কিছু। আদর্শ 'কথ্য বাংলা' সাহিত্যে প্রচলন করবার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকার স্বীকৃতি থাকা প্রয়োজন। মধুসূদনের পাশেই আর এক নাটককার ছিলেন 'সধবার একাদশী' রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। নাটকে এই কাজটি প্রথম ঘটে ওঠা সম্ভব হয়েছিল দুটি কারণে। এক, বহুকাল থেকেই সংস্কৃত নাট্যাদর্শ এই রীতি মেনে চলেছে— নারী ও স্বল্পশিক্ষিত নিম্নবর্গের মানুষের মুখে কথ্য ভাষা 'প্রাকৃত' ব্যবহার করা হবে; উচ্চবংশীয় পুরুষের মুখে ব্যবহৃত হবে 'সংস্কৃত' ভাষা— যা ঐশ্বর্যময়, সাহিত্য-গুণান্বিত, স্থানবিশেষে মধুর, গম্ভীর, উদাত্ত—কিন্তু কখনোই 'কথ্য' নয়। কাজেই নাটককারেরা

সেই আদর্শ অনুযায়ী সচেতনভাবেই নাট্যধৃত কোনো কোনো চরিত্রের মুখে 'কথ্য' ভাষা ব্যবহার করলেন। অন্যত্র কথ্য ভাষা ব্যবহৃত না-হওয়াই ছিল প্রচলিত রীতি। দুই, নাটক মূলত লেখা হয় সমকালের দর্শকদের জন্য। কোনো-না-কোনোভাবে সেই দর্শক অর্থাৎ সমকালের জনসাধারণকে তাৎক্ষণিকভাবে একাত্ম করে নিতে হবে নাট্যবস্তুর সঙ্গে। ভাষা ছাড়া সেই একাত্ম করে নেবার অন্য প্রক্রিয়া নেই। কাজেই ভাষাটিকে রাখতে হবে সমকালীন এবং কিছুটা প্রচলিত মৌখিক ভাষা।

প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্য ভাষার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল—

১. "বাবুরামবাবু চৌগোঁপ্‌পা— নাকে তিলক— কস্তাপেড়ে ধুতিপরা— ফুলপুকুরে জুতা পায়— উদরটি গণেশের মতো— কোঁচান চাদরখানি কাঁধে— একগাল পান— ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন, ওরে হরে! শীঘ্র বালি যাইতে হইবে, দুইচার পয়সায় একখানা চলতি পানসি ভাড়া কর তো। বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে ২ বে-আদব হয়। হরে বলিল, মোসায়ের যেমন কাণ্ড, ভাত খেতে বস্তেছিনু— ডাকা-ডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেচি।...চল্‌তি পানসি চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয়— একি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা?" (আলাল)

২. "ভবানীবাবু সকলকে ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠতে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম খান, অন্যকে ধেনো গোছ দেন। সঙ্গি বাবুদের বরাবর মিছরি খাইয়া মুখ খারাপ হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগিবে কেন? সুতরাং তাহারা ক্রমে ২ ছটকে পড়িতে লাগিল।" ('মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়')

কালীপ্রসন্ন সিংহ যে-ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'-য় তা আমাদের আজও বিস্ময়ে আপ্লুত করে রাখে। বাংলা কথ্য চলিত ভাষার জাদুশক্তি যেন কালীপ্রসন্ন সিংহ বাজিকরের মতোই তাঁর গ্রন্থে সঞ্চারিত করে আমাদের চমকে দিলেন। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—

১. "দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁধে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জমচেন। হেটো ব্যাপারীরা বাজারে ব্যাচাকেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। কলকেতা শহর বড়ই গুলজার। গাড়ির হররা, সহিসের পয়িস২ শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠচে— বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।"

২. "রাজা নবকৃষ্ণ কবির (কবিগান) বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রামবসু, হরু, নিলু রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবিগাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দেখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময়ে জন্মগ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা) নবকৃষ্ণের একজন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিফর্মেশনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক। তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান।"

তাহলে আমরা দেখছি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে কিন্তু লেখ্য চলিত ভাষার একটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা এ-কথা বারবার শুনেছি যে, বাংলা গদ্যে লেখার ভাষায় চলিত রীতির প্রবর্তন ঘটিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী। 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় (প্রথম প্রকাশ ১৯১৪)। ইতিহাসের কালক্রম অনুসরণ করলে এই দাবি কিন্তু একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই রীতির প্রয়োগ উনিশ শতকেই ঘটে গেছে তা আমরা দেখতে পেলাম। কিন্তু উনিশ শতকে এই প্রয়োগের মধ্যে একটু একপেশে ব্যাপার ছিল। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে বাংলা লিখন-পঠনের জগতে কথ্য চালের বাংলা গদ্যকে নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে ব্যঙ্গ-কৌতুকমূলক লেখার অভিব্যক্তির ভাষারূপে। সেই কথ্য ভাষায় লেখকেরা মিশিয়ে দিয়েছেন কিছু স্থূল রুচির আতিশয্য। শিক্ষিত ভদ্র-সমাজে অবাধে উচ্চারিত হয় না— এমন শব্দের প্রবেশাধিকার ঘটেছে সেখানে। তৎসম শব্দের তুলনায় প্রচল-তদ্‌ভব, অতি প্রাত্যহিক, দেশজ ও বিদেশী শব্দের সেখানে প্রাবল্য। গাম্ভীর্যের শোভন মন্ত্রধ্বনি ফোটে না সে-ভাষায়। এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র অভিযোগ করেছিলেন— "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই, হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন ধাবন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতাশূন্য।" (প্রবন্ধ : বাঙ্গালা ভাষা)

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত সর্বাংশে আমরা স্বীকার করব না। কিন্তু এটাও ঠিক যে উনিশ শতকে আমরা যে-লেখ্য চলিত বাংলা ভাষার সন্ধান পেলাম সেখানে রুচির স্থূলতা এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক সুরের আতিশয্য খানিকটা ছিলই। কথ্য ভাষার অনুসরণে যে-লেখ্য ভাষা রচনা করছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র,

কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত তা যেন আলাদা রাখা হয়েছিল এমন রচনার জন্য যা তৎকালীন রুচিতে শোভনশালীন বলে গণ্য হবে না। ব্যঙ্গ-কটাক্ষের সঙ্গে প্রায়শই যে চটুলতা এবং সময়-বিশেষে কিছু অশ্লীলতা মিশে যায় তা এই ভাষায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কথ্য বাংলা ভাষায় যেন এই জাতীয় সামাজিক বিদ্রুপই রচিত হবে, তার চেয়ে গভীরতর কোনো অন্তরের বাণী ঘোষিত হবে না।

এই ভাষা-সংস্কার উন্মুলিত করে দিলেন বিবেকানন্দ। তিনি কথ্য বাংলার বাক্-চাল ও সরস ভঙ্গিটিকে ছড়িয়ে দিলেন পরিব্যাপ্ত প্রয়োগের প্রাঙ্গণে। এই কথ্য বাংলায় তিনি কেবল তাঁর সমুদ্র-পথের জাহাজ-ভ্রমণের সরস বিবরণই দিলেন না, এই ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করলেন ইতিহাস; বিশ্লেষণ করলেন বিজ্ঞান; তুলনামূলক সমালোচনা করলেন ভারত ও অন্যান্য দেশের সমাজের; আলোচনা করলেন ধর্মতত্ত্ব, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি— কী নেই তাঁর 'পরিব্রাজক'-এর পেটিকায়। 'পরিব্রাজক' সংকলনের রচনাগুলি লিখিত এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৮ থেকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এই লিখন এক জ্ঞানভাণ্ডার বিশেষ। সবই কথ্য বাংলা ভাষায়। চলিত বাংলা ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম প্রয়োগে, বাংলা বাগ্‌ধারার সজীব বিন্যাসে।

লক্ষণীয় যে 'নববাবু বিলাস' লেখার সময়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রমথনাথ শর্মা' ছদ্মনাম নিয়েছিলেন; 'আলালের ঘরের দুলাল' রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্রের স্বনামে পরিচিতির পথে আড়াল ছিল 'টেকচাঁদ ঠাকুর' নামের; কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখেছিলেন 'হুতোম প্যাঁচা' নাম নিয়ে। এত ছদ্মনাম কেন? ব্যঙ্গ-সরস কথ্য ভাষায় সমাজচিত্র খুলে দেখাতে একটুখানি সংকোচ ছিল কি? নিজেকে স্বনামে প্রকাশ করতে কিছু কুণ্ঠা?

বিবেকানন্দের কোনো সংকোচ ছিল না। তখন ভারত-বিখ্যাত সন্ন্যাসী তিনি। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর বহু মানুষ তাঁকে জানেন। রামকৃষ্ণ মঠের মুখপত্র 'উদ্বোধন'— বহু বিদগ্ধজনের কাছে ও ভক্তজনের কাছে পৌঁছে যাবে সেই পত্রিকা। সেই পত্রিকায় নিজের নামে চলিত বাংলায় নিজের মনের কথা মেলে ধরলেন বিবেকানন্দ। এই ভাষাপথের খননে তাঁর পূর্বসূরি কেউ ছিলেন না। চলিত বাংলা ভাষাকে সর্বপ্রকার রচনার মাধ্যম করে তোলবার কাজে বাংলা সাহিত্যে প্রথম অগ্রদূত বিবেকানন্দ। 'লেখ্য চলিত' বাংলার প্রথম যথার্থ পথিকৃৎ প্রমথ চৌধুরীর ভাবনাচিন্তা আর 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠীর প্রয়াস, আগেই বলেছি, চোদ্দ বছর পরে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

'পরিব্রাজক'-এর প্রায় সমকালে রচিত এবং 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'ও চলিত বাংলায় লেখা। অবশ্য সমকালেই লিখিত অপর একটি রচনা 'বর্তমান ভারত' লেখার সময়ে বিবেকানন্দ সাধু বাংলাই ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্রেও দেখা যায়— চলিত ও সাধু— দুই ধরনের বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত। কিন্তু যখন বিবেকানন্দ সাধু বাংলা গদ্য লিখেছেন তখনও ভাষা-ভঙ্গির সারল্য, স্পষ্টতা ও ঋজুতা পরিস্ফুট। অতিরিক্ত অলংকৃত ভাষা ও ভাষার কৃত্রিম সাজসজ্জা পছন্দ করেননি কখনো। প্রমথ চৌধুরীর আদর্শ চলিত ভাষায় যে-সচেতন কারিগরি, যে-বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, উইট, পান-এর চারুবিন্যাস দেখি— বিবেকানন্দের চলিত বাংলার আদর্শ তা ছিল না। বোধহয় আজ স্বীকার করবার সময় এসেছে— বর্তমানে যে ভাবনামূলক গদ্য চলিত বাংলা ভাষায় লিখিত হচ্ছে তার প্রথম উৎসের সন্ধান বিবেকানন্দের এই 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-র মধ্যে পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দের পরিব্রাজক থেকে উদ্ধৃত করছি একটি অংশ। এই অংশে সংমিশ্রিত হয়েছে পরিবেশ বর্ণনায় সরস দৃষ্টিকোণ, চলিত শব্দ প্রয়োগের সংস্কারমুক্ত প্রবণতা, বাস্তবতার চিত্রকল্প রচনায় অসামান্য পারদর্শিতা, গতিমান বিবরণ রচনার ক্ষমতা এবং লেখকের সাহস। জাহাজ থেকে হাঙর শিকারের বেশ প্রশস্ত এক বর্ণনাংশ আছে। হাঙরের জন্য জলে ফেলা হয়েছে টোপ। 'ভীষণ' একটি বঁড়শি জোগাড় হল, যেটিকে বলা যায়, 'কুয়োর ঘটি তোলার ঠাকুরদাদা'। তাতে সের খানেক মাংস আর ফাতনার কাঠ বেঁধে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। হাঙর আসছে একটি দুটি করে মাংসের লোভে। জলের মধ্যে দুলছে কালো মাংসখণ্ড; জলের উপর ভাসছে চর্বির তেল; সূর্যালোকে সেই ভাসমান স্নেহপদার্থের শরীরে নানা রঙের খেলা। বিবেকানন্দের বর্ণনা— "...আগে আগে চলেছেন 'পাইলট ফিস', আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাবড়া'; তাঁর আশেপাশে নেত্য করছেন 'হাঙ্গর-চোষা' মাছ। আহা ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক ঝিক করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কতদূর ছুটেছে তা 'থ্যাবড়াই' বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—

সাদা, লাল, জরদা— এক জায়গায়! আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!"

এক তাল 'আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস'-কে জলকেলিরত কৃষ্ণ, আর শুয়োরের চর্বির ধারাসমূহে রঙিন বেশ পরিহিত গোপীদের সঙ্গে তুলনা করবার মধ্যে ঔপম্য সাদৃশ্যের অভিনবত্বের দিকটিও যেমন ভোলা যায় না, তেমনই অবাক হতে হয় লেখকের সংস্কারমুক্ত মনের সাহস দেখে। শূকর-মাংসের সঙ্গে কৃষ্ণের তুলনার ছবি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধাও জাগেনি তাঁর মনে। বিবেকানন্দের মনে আরোপিত সংস্কারের কোনো স্থান ছিল না। তিনি হয়তো মনে রেখেছিলেন— কৃষ্ণেরই অবতার বলে শূকর স্বীকৃত এবং শূকর-মাংস গ্রহণ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতে উচ্চবর্ণের মানুষের কোনো বাধাই ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র এই কথ্য ভাষার আদর্শটি অনেকটা রেখেছিলেন। তার সঙ্গে অসামান্য প্রতিভাবলে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন তৎসম শব্দের ধ্বনি-বর্ণময় সূক্ষ্মতা, উজ্জ্বলতা ও গম্ভীর মাধুর্য। তাঁর উপন্যাসের বাস্তবতাগুণ, সংহতিগুণ, নাট্যগুণ— সবই তাঁর কালের অন্যান্য লেখকের চেয়ে অনেকটা বেশি ছিল। তাই প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে আসমানি-বিদ্যাদিগ্‌গজের বাক্যালাপ থেকে শুরু করে শেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-এর একাধিক জনতা দৃশ্য এবং দুই জনতা প্রতিনিধি রামচাঁদ শ্যামচাঁদের কথোপকথনে ফুটে ওঠে সেই আদর্শ কথ্য ভাষার স্বরূপটি। এ-কথা ঠিকই যে বঙ্কিম সংলাপ অংশেও কথ্য ভাষায় সাধু ক্রিয়াপদের রূপ ব্যবহার করেছিলেন। সে-কারণে যথার্থ কথ্যভাষা হিসেবে সেই উদাহরণ আমরা তুলে ধরতে পারি না। তবু কথ্য ও মৌখিক ভাষার চাল, স্পন্দন এবং সজীবতা তাঁর উপন্যাসে, সমকালীনদের তুলনায় তো বটেই, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়ও অনেক বেশি অনুভূত হয়। সময়ে সময়ে তা চলিত ক্রিয়াপদকেও স্থান দিয়েছে। চমৎকার একটি উদাহরণ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে 'সুমতি' ও 'কুমতি'— এই দুই রূপক চরিত্রের দ্বন্দ্ব। সেখানে গোবিন্দলালের মনের গতি সৎপথে ফেরাতে না-পেরে সুমতি শেষপর্যন্ত বলে— "তবে তুমি গোল্লায় যাও।" কুমতির শেষকথা— "রোহিণী সঙ্গে যাবে কি?"— এ ভাষার জীবনমুখীনতা অতুলনীয়।

সেই সঙ্গেই যদি স্মরণ করি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অরণ্য ও সমুদ্র-বর্ণনা, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ঝড় আর 'আনন্দমঠ'-এর দুর্ভিক্ষ-চিত্র তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুতই হয়ে দাঁড়ান বাংলা লেখ্য সাধু গদ্য ভাষার সম্রাট। বাহুল্যবোধে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি না।

এর পরে আসে রবীন্দ্রলেখনী সঞ্জাত গদ্য ভাষা। কিন্তু তার আগে এই প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে হয়নি ভাষা নির্মাণের শ্রম। বর্ণনায়, সংলাপে, দৃশ্যরূপ নির্মাণে, মনোবিশ্লেষণে, নাটকীয়তায়, পদান্বয় প্রতিষ্ঠায়, কাব্য স্পন্দনের অনুপ্রবেশে, বিশেষণ ব্যবহারের বৈচিত্র্যে, উপমার বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যকে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর করে দিয়েছিলেন। এ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তেমনভাবে কলম ধরবার আগেই।

তবু রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যে আমাদের নতুন কিছু দিলেন। সেই নবীনতার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে যাত্রা শুরু করল উনিশ শতকের শেষ দশকের বাংলা গদ্য। ১৮৯৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'রাজর্ষি'। তার আগে 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ও কিছু ছোটগল্প লিখে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যে নিজস্ব রীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। গদ্য ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় সুকুমার সেন রবীন্দ্র-গদ্যে অলংকার বাহুল্য দেখেছেন। তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' বইটিতে উদাহরণ তুলে দেখিয়েছেন কীভাবে রবীন্দ্র গদ্যে উৎপ্রেক্ষা, উপমা, রূপক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ইঙ্গিত, ব্যাজস্তুতি, এমন-কি অনুপ্রাসও অপর্যাপ্ত। এত অলংকার-বহুলতা কি গদ্যের পক্ষে উপযোগী? সর্বক্ষেত্রে উপযোগী নয়— মানতেই হবে এ-কথা। রবীন্দ্র-গদ্য মন্ময় রচনার পক্ষে উপযোগী হলেও যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের পক্ষে খুব উপযুক্ত হয়নি। প্রবন্ধে যদি বিশ্লেষণের জায়গা নেয় আবেগী উচ্চারণ, যুক্তি স্থাপনার স্থান নেয় উপমা-বিন্যাস তাহলে সমগ্র সিদ্ধান্তই হয়ে পড়ে দুর্বল। মণিকারের ছুরি হীরকখণ্ডকে কেটে কেটে উজ্জ্বলতা দেয়। কিন্তু সেই উপমা প্রয়োগে যদি লেখক প্রমাণ করতে চান বিধাতার ছুরি মানব-চরিত্রকে কেটে কেটে উজ্জ্বল করে তোলে— তাহলে সে-কথা সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে গৃহীত হতেও পারে, প্রবন্ধে কখনো নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা যে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে কোনো অনুসারক সৃষ্টি করেনি তার কারণ তাঁর প্রতিভার অননুকরণীয়তা। প্রাবন্ধিকেরা তাঁর প্রবন্ধের গঠন ও ভাষাকে অনুসরণ করবার চেষ্টাই করেননি, প্রবন্ধের পক্ষে সে-ভাষার অনুপযোগিতা বিবেচনা করেই।

কিন্তু গদ্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান স্বতন্ত্র। এককথায়

হয়তো তাঁর ভাষাকে আমরা বলতে পারি ঈষৎ অ-বাস্তব। অ-বাস্তব 'মিথ্যা' অর্থে নয়। জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস-নাড়ি-স্পন্দনময় জীবন্ত চেহারাটি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত। সেখানেই বঙ্কিমি গদ্যের সর্বোত্তম স্টাইল-এর পরিচয়। স্বাভাবিক হয়ে ওঠায়— জীবন্ত হয়ে ওঠায়— বাস্তবিক হয়ে ওঠায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যেই আমরা প্রথম পেলাম 'স্টাইলাইজেশন'। তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমস্যাটি বাস্তব। কিন্তু ভাষাটিকে যেন তিনি বাস্তবের তল থেকে ঈষৎ ভিন্ন তলে স্থাপন করলেন। যুধিষ্ঠিরের রথের চাকার মতো তাঁর গদ্য-ভাষা জীবন-বাস্তবের ভূমি থেকে একটু উপর দিয়ে চলতে থাকল। প্রথম যুগে লেখা তাঁর একটি ছোটগল্পকে নেওয়া যাক। গল্পটির নাম 'ব্যবধান'। বনমালী নামের এক যুবক হিমাংশু নামের তার বালক জ্ঞাতি ভাইটির সারল্য, চাঞ্চল্য এবং বালকত্ব বড় ভালোবাসে। দুই পরিবারের একটি মামলার নিষ্পত্তিতে হিমাংশুরা যেদিন হারল সেদিন থেকে বনমালীর কাছে হিমাংশুর যাতায়াত বন্ধ করে দিল তার অভিভাবকেরা। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি শেষ করেছেন— "এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহের সাতটা দিনই যখন দূরদৃষ্ট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আশাকে আশ্রয় দিবার জন্য যখন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশুদের রুদ্ধদ্বার অট্টালিকার দিকে তাহার অশ্রুপূর্ণ দুটি কাতর চক্ষু বড়ো একটা মর্মভেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আর্তস্বরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল, 'দয়াময়!'"

একটি বালকের বিরহে একটি বয়স্ক মানুষের এই শূন্যতাবোধের কথা বঙ্কিম যদি লিখতেনও— স্বভাবসিদ্ধ সরল সংক্ষিপ্ত ভাষণে দু-এক কথায় সেরে দিতেন তা, একমাত্র 'কপালকুণ্ডলা'-র দু-একটি দৃশ্য ছাড়া বর্ণনাকে তিনি কোথাও দীর্ঘায়িত হতে দেননি। প্রয়োজনেও না।

বঙ্কিমের মানসিক সংকট-বিদ্ধ সামাজিক উপন্যাসগুলিতে যেখানে ব্যক্তির হৃদয়ভাব বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়েছে সেখানেও তিনি অতিশয় সংক্ষিপ্ত। 'বিষবৃক্ষ'-এর নগেন্দ্র, 'চন্দ্রশেখর'-এর শৈবলিনী, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর গোবিন্দলাল— সর্বত্রই এরকম উদাহরণ পাওয়া যাবে। একটি প্রভাতের নিশ্চিন্তে তৃপ্তি বর্ণনায় 'গোরা' উপন্যাসের পুরো একটি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই তৃপ্তিবোধও বিনয়ের— নায়ক গোরা-র নয়। 'গোরা' উপন্যাসের মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে সেই প্রভাত-বর্ণনার সংযোগও কি খুব ঘনিষ্ঠ? যতটা ঘনিষ্ঠ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সে-উপন্যাসে অরণ্য ও সমুদ্রতীর বর্ণনার সংযোগ? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বোধহয় সংযোগের এই নৈকট্য নিয়ে ততটা ভাবিত ছিলেন না। অন্য এক ধরনের দুরাশয় সংযোগ তাঁর মনের মধ্যে রূপ নিচ্ছিল। যেখানে বিশ্ব-প্রকৃতির বিশালতায় মানবজীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কণিকাটিও সংযুক্ত। 'চোখের বালি' কিংবা 'গোরা'-র তুলনায় এই বিষয়টি অনেক বেশি স্পষ্টতা পায় 'যোগাযোগ'-এ। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে পড়লে কুমু-মধুসূদন-শ্যামা ত্রিভুজ-কাহিনি যে-আকার নিত— তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কলমে। ত্রিভুজের জটিলতা কোনো গুরুত্বই পায়নি। কুমু-কে কেন্দ্র করে বিশ্বের কোন্ অংশের সঙ্গে সে মিলিত হতে পারছে আর কোন্ অংশের সঙ্গে পারছে না— এটিই যেন বড় হয়ে উঠেছে সমগ্র উপন্যাসে। সেজন্য বিপ্রদাসের ঘোড়াটিকে কুমু কীভাবে আদর করল, রুমালে বাঁধা কয়েকটি এলাচ একটি বালকের সঙ্গে বন্ধনে তাকে কোন্ প্রীতির গ্রন্থি ধরে টান দিল— ইত্যাদির বিবরণে রবীন্দ্রনাথ যে-গুরুত্ব দেন, শ্যামা-মধুসূদনের অবৈধ শারীর সম্পর্কের বর্ণনায় তার কিছুই দেন না। সেই সব ক্ষেত্রেও তাঁর গদ্য চলতে থাকে জলভারনত মেঘের আকাশ-সঞ্চরণের মতো। সেখানে দীর্ঘ বাক্য, পরম্পরিত বাক্যের প্রলম্বন। সেখানে উপমা উপমায় কাহিনির বন্ধন কেবলই বৃত্তাকারে ব্যাপ্ত হতে থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় বন্ধনই যেন হয়ে পড়ে গৌণ। ক্রিয়াপদের বিপ্রতীপ ক্রম— অর্থাৎ বাক্যের প্রথমে ক্রিয়াকে ব্যবহার করে তিনি একটি কাব্য ও স্পন্দন নিয়ে আসেন। এবং গদ্যের সমগ্র প্যাটার্নটিই এমনভাবে সাজানো যাতে উপন্যাসের কাহিনি-অংশ ছাপিয়ে একটা ভাবের অংশ কেবলই প্রাধান্য পেয়ে যায় তাঁর লেখায়। বক্তব্য ও বাচনের আঁটোসাঁটো সম্পর্কটি শিথিল হয়ে ছড়িয়ে যায় চারদিকে। সেই ছড়িয়ে-যাওয়া ধরনটির ভেতর থেকে উঠে আসে অন্য একটা ভাব— যা কাহিনিটির ঘটনাংশ ছাপিয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে ছাপিয়ে ওঠার ব্যাপারটি খুব বেশি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাষা যেন এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। কথাসাহিত্যের ভাষাকে কথাসাহিত্যে নিবদ্ধ ঘটনাংশের প্রয়োজন ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র শিল্পগুণে ঋদ্ধ করে তোলার চেতনা প্রথম রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই দেখা গিয়েছিল মনে হয়। এই ছাপিয়ে যাবার ব্যাপারটা গল্প-উপন্যাসে সর্বত্রই গুণ হয়ে দেখা দিয়েছে কি না সেটি আলাদা প্রশ্ন।

ভাষার এই স্টাইলাইজেশন চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে 'শেষের কবিতা' ও 'তিন সঙ্গী'-র গল্পগুলিতে। মনে হয় 'শেষের কবিতা'র চেয়ে 'তিনসঙ্গী'র ভাষা বেশি কার্যকর। কারণ 'শেষের কবিতা'য় মূল কাহিনিটি কিছু গতানুগতিক। ভাষা সেখানে কিছু আতিশয্যময় লাগে। 'তিন সঙ্গী'-র গল্পগুলিতে আধুনিক জীবনের বিচিত্র ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথের চমকে দেওয়া অসম্ভব শীলিত ও শিল্পিত ভঙ্গিটি সেখানে মনে হয় অপরিহার্য। ওই ভাষা আমাদের বাধ্য করে প্রতিটি বাক্য পড়তে, বাধ্য করে পদে পদে এক নতুন যুগের মননের মুখোমুখি দাঁড়াতে।

শরৎচন্দ্র বিশ শতকের প্রথম পাদের উপন্যাস-সাহিত্যে প্রধানতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। সেই জনপ্রিয়তার একটা কারণই হল তাঁর সরল এবং উচ্চাশাহীন ভাষা। তিনি যেন ফিরে গেলেন আবার জীবন-বাস্তবের সরল প্রতিরূপায়ণে। এই সারল্যই তাঁর শক্তি। বঙ্কিমের চেয়েও অনেক বেশি তাঁর বস্তু-সংলগ্নতা। সেজন্যই তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। সাধারণ পাঠক তাঁর উপন্যাসে ব্যক্ত অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে সেই সরল সংযোগটি পেয়ে যান। তরতর এগিয়ে চলে উপন্যাস। গল্পটিকে সম্পূর্ণ ও নিটোল করে পাবার পথে ভিন্নতর কোনো ভাবনার বাধা নেই। ভাষা সর্বতোভাবে সেই গল্প গড়ে নেবার সহায়ক। শরৎচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব সংলাপে কথ্য ভাষাকে একেবারে বক্তার চরিত্রের অঙ্গীভূত করে ব্যবহার করা। ভাষা দিয়ে মানুষ চেনা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বা গল্পে তা চেনা যায় না। প্রায় একই ব্যাকরণসম্মত ছক ব্যবহৃত হয় সকলেরই কথায়। নিম্নবর্গের মানুষের মুখের ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করতেই যান না। শরৎচন্দ্রের বর্ণনার গদ্যটি সাধু বাংলা হলেও অত্যন্ত সহজ বিবৃতিময়তার পথ ধরে তা এগোয়। যেখানে তিনি চরিত্রের অন্তর্নিহিত জটিলতার উন্মোচন করতে চেষ্টা করেন সেখানেও তা সাধারণ পাঠকের গড়পড়তা ভাষাবোধের ক্ষমতার পরিসীমার মধ্যেই থাকে।

শরৎচন্দ্রের ভাষার মূল কৃতিত্বটি হয়তো এখানেই যে তিনি অত্যন্ত আপাত-সাধারণ, চলতি বাংলা কথ্য ভঙ্গি বজায় রেখেই তার মধ্যে গভীর অনুভবকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। এত সহজ এত অভ্যাস-পরিচিত ভাষায় এত বেদনা ও মাধুর্যের সঞ্চার করতে পারেননি বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ। তাঁরা সকল সময়েই সজ্জিত, অলংকৃত, সচেতন, প্রস্তুত, প্রসাধিত, শিল্পিত— প্রয়োজনে একটু অস্বাভাবিক। সেরকম প্রয়োজনই বোধহয় শরৎচন্দ্র বোধ করেননি কখনো। জীবন তার স্বাভাবিক স্বরূপেই অনন্ত বৈচিত্র্যময় ছিল তাঁর কাছে। বাঙালি উপন্যাসকারদের মধ্যে তিনিই প্রথম এবং এখনও মুষ্টিমেয়র মধ্যে একজন— যিনি উপন্যাসোপম জীবনযাপন করেছিলেন। জীবনের রস— কোনো ভাবনা-কল্পনা-পঠন-মনন-দার্শনিক বোধের মধ্য দিয়ে তিনি পান করেননি। একেবারে সরাসরি তা জেনেছেন— ক্ষুধার অন্নে, পিপাসার জলে, বাস্তবের ভাঁজে ভাঁজে। তাই তিনি পেরেছিলেন সম্পূর্ণ সহজ কথার মধ্য দিয়ে সেই জীবনকে স্পর্শ করতে যা সহজ ও গভীর। বরং যেখানে অতিরিক্ত জটিলতার দাবি সেখানেই তিনি কম সার্থক। অচলা বা জীবানন্দের মনঃসংকট তাঁর কলমে সর্বোত্তমভাবে রূপ পেয়েছে একথা বলব না। তাঁর চেয়েও ভালোভাবে হয়তো পারতেন কেউ কেউ। কিন্তু রাম ও নারায়ণীর পরস্পর সম্পর্ক; বাড়ির ছোটদের প্রতি সিদ্ধেশ্বরীর স্নেহ, 'বামুনের মেয়ে' ও 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে সমাজের বর্ণভেদ-বিন্যাসের বিষময়তা যেভাবে তাঁর ভাষায় প্রকাশিত তা অসাধ্য ছিল অন্যদের।

শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষাকে নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন— এই দুদিক দিয়ে। একজন শিল্পিত ভাষায় জীবনকে প্রতিবিম্বিত করেছিলেন। আর একজন অশিল্পিত ভাষায়। সেটাও অবশ্য একধরনের শিল্পচেতনাই হয়ে দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রনাথকে চলিত ভাষার দিকে টেনেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, যিনি রবীন্দ্র-জীবৎকালের সবচেয়ে স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ভাষাশিল্পী। সময় বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্র-গদ্যরীতির মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্যারেনথিসিস-বহুল পরম্পরাযুক্ত, ঈষৎ দীর্ঘ বাক্যাবলি ব্যবহার করেন সেখানে প্রমথ চৌধুরী অনেক ছোট মাপের, সুনির্দিষ্ট বাক্য ব্যবহার করেন। বেশ স্পষ্টভাবে বাক্যের মধ্যে সিদ্ধান্তগুলি বোঝা যায়। ফরাসি গদ্যরীতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই হয়তো হয়েছিল এরকম। রবীন্দ্র গদ্যে যেখানে আবেগস্পন্দিত উপলব্ধি প্রধান হয়ে ওঠে, প্রমথ চৌধুরী সেখানে আবেগকে কেটে কেটে বাস্তব-অবহিত 'কমন সেন্স'-এর অভিব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেন। রবীন্দ্র গদ্যে স্নিগ্ধ স্মিত হাস্যরসের প্রকাশ প্রায়ই লক্ষ করা যায়। তাকে প্রসন্ন জীবনরসও বলা যেতে পারে। নিঃসন্দেহেই তা হিউমার জাতীয় রস। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীই প্রথম তীক্ষ্ণভাবে উইট-জাতীয় মননশীল

উপভোগের ভাষা তুলে দিলেন বাঙালি পাঠকের কাছে। পরিহাসপ্রিয়তা এবং জীবনকে কিছুটা তির্যক কটাক্ষে দেখবার অভ্যাসে তাঁর ভাষা হয়ে উঠল পান (pun), অ্যান্টিথিসিস, এপিগ্রাম ও প্যারাডক্স-এ ঝকঝকে। ভাষা তখনই সার্থক হয় যখন তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় লেখকের ব্যক্তিত্ব। প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বটিও তাঁর ভাষায় দীপ্যমান। উদাহরণ— "সমাজে আগে হয় বিয়ে পরে সন্তান, তারপর মৃত্যু; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা, তারপর বিয়ে, নয় মৃত্যু। এক কথায় মানুষের জীবনের যা হয়, তার নাম প্রাণান্ত! কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত নয় বিয়োগান্ত; হয় ঘটক নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।" এটি কোনো প্রবন্ধের অংশ নয়। তাঁর বিখ্যাত 'আহুতি' গল্পের কয়েক পঙ্‌ক্তি। গল্পের প্রয়োজনে তাঁর প্রকৃতি বর্ণনাও কত স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত তারও উদাহরণ দেওয়া যায় 'আহুতি' গল্পটি থেকেই— "এ যেন ইটের রাজ্য। যতো দূর চোখ যায়, দেখি শুধু ইট আর ইট, কোথাও বা তা গাদা হয়ে রয়েছে, কোথাও বা তা হাজারে হাজারে মাটির ওপর বেছানো রয়েছে, আর সে ইট এত লাল যে, দেখলে মনে হয়, টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে। এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ, কিন্তু তার একটিও পাতা নেই, সব নেড়া সব শুকনো, সব মরা।" বাংলা কথাসাহিত্যে প্রকৃতি বর্ণনা আমরা কম পাইনি। তবু, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পরেও এ-ভাষা আমাদের আকৃষ্ট করে দুটি কারণে— প্রথমত, ভাষার একটি কাঠিন্য। এ যেন সেই ভাষা— যা 'শুষ্কং কাষ্ঠং'-কে বরণ করেছে 'নীরস তরুবর'-এর চেয়ে এবং প্রমাণ করেছে স্থান বিশেষে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' 'নীরস তরুবর'-এর চেয়ে বেশি সরস কারণ ভাষার সাফল্য নির্ভর করছে রচয়িতার অভিপ্রায় ধারণে, নিছক সুন্দর হয়ে ওঠায় নয়। দ্বিতীয়ত, এই ভাষায় লেখকের শিল্পদৃষ্টি তথা ব্যক্তিত্ব চমৎকারভাবে প্রকাশিত, গল্পের সামগ্রিক গঠনে অংশটির অপরিহার্য বিন্যাসের কথাও স্মরণে রাখতে হবে।

'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। সে-চলিত ভাষা কথ্য বাংলার প্রাণ স্পন্দনকে ধারণ করে না— এমন অভিযোগ আমরা করে থাকি, কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর নিজের ধারণাটি আগাগোড়াই ছিল অন্যরকম— "আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে। তার কারণ, কলকাতা রাজধানীতে বাংলা দেশের সকল প্রদেশের অসংখ্য শিক্ষিত ভদ্রলোক বাস করেন। ঐ একটি মাত্র শহরে সমগ্র বাংলাদেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এবং সকল প্রদেশের বাঙালি জাতির প্রতিনিধিরা একত্র হয়ে পরস্পরের কথার আদান প্রদানে যে নব্য ভাষা গড়ে তুলছেন, সে ভাষা সর্বাঙ্গীণ বঙ্গ ভাষা!" (বঙ্গ ভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধু ভাষা)

লক্ষ করবার বিষয়— প্রমথ চৌধুরী 'কথ্য ভাষা' বলেননি— বলেছেন 'নব্য ভাষা'— বোঝাতে চেয়েছেন শিক্ষিতজনের 'স্ট্যান্ডার্ড' ভাষা যার লিখিত চেহারার অনুশাসিত আকারই হবে সাহিত্যের প্রধান মাধ্যম। আমরা যখন কথ্য ভাষার সপক্ষে সওয়াল করি তখন কথ্য ভাষার একান্ত বাচনিক স্বর প্রক্ষেপ, আঞ্চলিকতা, দেশী শব্দাবলি— ইত্যাদির অনুপ্রবেশকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সেই 'স্বাভাবিকতা'-কে আটকাতেই চেয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি 'কথ্য ভাষা' নয়, একটি 'সাহিত্যিক ভাষা'ই নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন যার অবলম্বন নগরবাসী, শিক্ষিত ভদ্রজনের মৌখিক ভাষা। সে-ভাষার শালীনতা, সংযম, সংহতি, পরিচ্ছন্নতা, যৌক্তিকতা এবং নাগরিকতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাঁর অভিমত যে আমরা সর্বাংশে মানতে পারি না তার কারণ এই— সাহিত্য ব্যাপারটা আদৌ সব সময়ে সেরকম পরিচ্ছন্ন, সংযত, নাগরিক নয়। প্রয়োজনে আঞ্চলিক শব্দ, অশালীন শব্দ, অপ্রচলিত শব্দ সবই সাহিত্যে নিতে হবে। কিন্তু বাংলা গদ্য ভাষার বিবর্তনে প্রমথ চৌধুরীর নাম আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। মোটের উপর তাঁর প্রস্তাবিত সাহিত্যের ভাষাই পরবর্তী প্রায় তিন দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বপ্রধান গদ্যভাষার আলাদা আলাদা মান যে-সমস্যার সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী লেখকদের সামনে— সেখান থেকে একটি সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য পথের সন্ধান দিয়ে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের একটা আদর্শ নির্ধারণ করেছিলেন তিনিই।

তিরিশের কালপর্বের মধ্যভাগ থেকে বাংলা গদ্য এতটাই সমৃদ্ধি অর্জন করেছে যে সীমাবদ্ধ পরিসরে তার আলোচনা সম্ভব নয় আর। বিবৃতিমূলক বাংলা গদ্য যে কত বৈচিত্র্যময় ও লাবণ্যময় হতে পারে, তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যই তার প্রমাণ। এঁদের এক-একজনের গদ্য সম্পর্কে এত কথা বলবার থাকে যে পৃথক গ্রন্থ লেখা চলে। বর্ণনা, বিশ্লেষণ, সংলাপ, ঘটনাত্মক ক্রিয়া, উপমা-চিত্রকল্প, শব্দভাণ্ডার, বাক্যের গড়ন সর্বত্রই এঁরা অতুলনীয়। বস্তুত এঁদের গদ্যে কোনো শৈথিল্য

আবিষ্কার করাই কঠিন। বিশ্বের ভাষাগোষ্ঠীগুলির বিন্যাসগত কারণে ইংরেজি বা ফরাসির মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চ পাওয়া সম্ভব নয় বলেই বাংলা গদ্যের এই সবল সৌন্দর্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করা যাবে না সেইভাবে। অনুবাদে কথাসাহিত্যের কাহিনিটি থাকে; কিন্তু ভাষা অবলুপ্ত করে দিয়েই তো অনুবাদ।

এই সময়ে যে-লেখকরা গল্প উপন্যাস লিখেছিলেন, তাঁরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধরনে ভাষাকে কথাবৃত্ত-ছাপানো কোনো ভিন্ন শৈল্পিক অভিপ্রায়ের মাধ্যম করতে আগ্রহ বোধ করেননি। বলা যেতে পারে বঙ্কিমি ধরনে তাঁরা ভাষা ও ভাষ্যের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কেই বিশ্বাসী ছিলেন। আলাদাভাবে ভাষার কারুকাজ কোনো কারণেই জরুরি হয়ে উঠবে তা তাঁরা ভাবেননি। এমন-কি ধূর্জটিপ্রসাদের চেতনাপ্রবাহমূলক ভাষাও এসেছে মনঃসমীক্ষণের ব্যাপারটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্য। সেখানে অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেননি ধূর্জটিপ্রসাদ। বাস্তবের উপর কোনো আপাত অবাস্তবের আবরণ তিনি চাপাননি।

কিন্তু সাহিত্যের গদ্য কাহিনিটিকে সর্বতোসূক্ষ্মতায় উপস্থাপিত করবার পরেও তার ভিন্নতর ব্যঞ্জনা-বলয় নির্মাণ করবারও একটা কাজ থাকতে পারে— এ-কথাও ভুলে যাননি এই কালের কোনো কোনো ঔপন্যাসিক। সেই ব্যঞ্জনাটি উপন্যাস-বহির্ভূত কিছু নয়, তা উপন্যাসকারের অভিপ্রায়েরই অঙ্গীভূত; ভাষার কিছু বিশিষ্ট, প্রসাধিত কারুকর্ম দ্বারা সেই অভিপ্রায়টিকে লেখক আলাদা করে তুলে ধরেন। এই মাত্র।

প্রথমেই মনে পড়ে কমলকুমার মজুমদারের নাম। সাম্প্রতিক বাংলা ও সাহিত্য-ভাবনায় যথেষ্ট আলোচিত তাঁর নাম। তাঁর গদ্য-ভঙ্গির পক্ষে আছেন অনেকে, আবার বিপক্ষেও অনেকে। কিন্তু কেন তিনি এমন ভাষা লেখেন তা অনুধাবন করেছেন কোনো কোনো সাহিত্যিক। দুজনের মত উদ্ধার করছি—

দেবেশ রায়— "ব্যক্তিমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা হতাশা ও সামাজিক মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়াসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাংলা গদ্যসাহিত্য সমাজ পরিবেশহীন ব্যক্তিত্বহীন চরিত্রের নেহাৎ ক্ষুদ্রতর পরিবেশে সংকীর্ণ হয়েছে। এই ক্ষুদ্রতর পরিবেশ থেকে কমলকুমার মজুমদার নিজস্ব প্রকরণের সাহায্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। এই বিচ্ছিন্নতা তাঁকে বিশিষ্ট করেছে।... তাই কমলকুমার মজুমদারের ভাষা প্রকরণের বিশিষ্টতার সাধনা সাহিত্যিকের বিশিষ্ট মণ্ডল থেকে বের করে এনে বৃহত্তর বিষয়ের ভেতর মুক্তি দেয়। তাঁর ভাষার বিশিষ্টতা আসলে তাঁর বিষয়ের সার্বজনীনতাকে ধারণ করে।" (কথা সাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা, পরিচয়, পৌষ-মাঘ, ১৩৮০)

আমরা এর আগে বলতে চেয়েছি যে, ভাষার এ-জাতীয় ব্যবহার বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম শুরু করেন। বর্ণিত বিষয়ের সীমাবদ্ধতার বাইরে বৃহত্তর জীবন-ব্যাপারের সমগ্রতার সঙ্গে লেখকের অভিপ্রায় যুক্ত হয়ে যায় ভাষার মাধ্যম ব্যবহার করে। তা বর্ণিত, বিশ্লেষিত বা ব্যাখ্যাত নয়, তা ব্যঞ্জিত। আলোক সরকার লিখেছেন— "Ideal Beauty মালার্মের অন্বিষ্ট ছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাবের স্বাধীন লোক, কমলকুমারের অন্বিষ্ট ছিল Ideal Man। উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে মালার্মে কবিতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগীতের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন, কমলকুমার ভাষার প্রচলিত অন্বয় ভেঙে এবং নিবিষ্ট একক প্রতীক ব্যবহার করে তাঁর Ideal Man-এর জীবনযাপন, তার বিশুদ্ধতাকে অভিব্যক্ত করতে চেয়েছেন।" (কমলকুমারের মানুষ ও ভাষা, সমতট, শারদীয় ১৩৮৬) এই উক্তির সঙ্গে একমত হই বা না-হই— আলোক সরকারও এখানে কমলকুমারের ভাষায় সেই অভিপ্রায় দেখেছেন যার সঙ্গে কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির।

সাহিত্যরসিক বাঙালি মাত্রেই কমলকুমার-সাহিত্যের সঙ্গে আজ পরিচিত বলে তাঁর ভাষা তাঁর বর্ণিত কাহিনিটি থেকে আলাদা হয়ে উঠে তাঁর চিন্তন-প্রক্রিয়া এবং 'ভিশন'-এর বাহক হতে পারে। এরকমই আর একজন গদ্যলেখক জীবনানন্দ দাশ। বাস্তব জীবন সম্পর্কে তাঁর যে-অভিজ্ঞতা তাতে আমাদের কাছে প্রায় অচিন্তনীয় চিন্তন-পদ্ধতি এবং নিবিড় 'ভিশন' সহযোগে প্রকাশ করবার জন্য তিনি আপাত-অবাস্তব বর্ণন ও সংলাপ নির্মাণ করতেও কুণ্ঠিত হন না। একেই বলা যেতে পারে বাস্তবের আকারকে ভেঙেচুরে বাস্তবের অন্তরকে স্পর্শ করা। আধুনিক বিমূর্ত চিত্রকলার মতো। ভাষা মূর্ততারই জ্ঞাপক। তাঁর পাশাপাশি অমিয়ভূষণকেও রাখব। যিনি বলেন— "আমার ভাষা আমার মতোই হয়। কেন হয় তা একটা thought process— আমার ভিশনের অংশ।" (কবিতীর্থ, অক্টোবর ১৯৮৬) অমিয়ভূষণ মজুমদার খুবই সুসংবদ্ধ প্লটপ্রধান উপন্যাস লেখেন। তবু তার মধ্যেও ভাষার অতীন্দ্রিয় আভা দেখা যায়। জীবনানন্দের সাফল্য অবশ্যই আমাদের কাছে এখনও সর্বোত্তম বলে মনে হয়।

বর্তমানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি বাংলা গদ্য বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর পরেও আরো সমৃদ্ধ, সূক্ষ্ম, বিচিত্র

হয়েছে। তা কখনো গতানুগতিক হয়ে পড়েনি, সবচেয়ে বড় কথা তা কোনো সময়েই নকল করেনি একে অপরের। কমলকুমার-ভক্ত হয়েও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সুবিমল মিশ্র প্রত্যেকে স্বতন্ত্র।

উপন্যাস-গল্পের যেহেতু একটা সাধারণ পাঠক-মনোরঞ্জনের দিকও আছে, তাই চিরকালই একজাতের কথাসাহিত্যিক আছেন যাঁরা সহজ গদ্য লিখবেন যার সাহায্যে বর্ণিতব্য বিষয়টি পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে। কিন্তু তার বেশি কিছু হবে না।

শরৎচন্দ্রের কালে শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে অন্যান্য উপন্যাসকারের ভাষায় সেই সহজতা অনেকটা তরলতায় পর্যবসিত। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাটের কালপর্বে সেরকম সহজ সুবোধ্য বাংলা গদ্যভাষাও প্রচুরভাবে চর্চিত হয়েছে। সেই ধারাও প্রতিভাবানের লেখনী স্পর্শে কত স্বচ্ছন্দ, সুন্দর, যাথার্থ্যময় রূপ পেতে পারে তা দেখতে পাই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। একেবারে একালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গদ্যের এই মনোরমতা গুণ অস্বীকার করা যায় না। প্রিসিশন-এর এবং বৌদ্ধিক দীপ্তির অসামান্য মিশ্রণে স্বাদু সত্যজিৎ রায়ের গদ্য। একেবারে সাম্প্রতিক কালের উপন্যাসকার ও গল্পকারেরা বাস্তবনিষ্ঠ ভাষার নতুন নতুন দিগন্ত যেন উন্মোচন করছেন ক্রমেই। আঞ্চলিক শব্দাবলি ও ভাষার আবার বহুমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কোনো অর্থেই আজকের বাংলা গদ্য নবীন নয়। তবে অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, কমলকুমার মজুমদারের মতো স্বাতন্ত্র্য-সমৃদ্ধ এবং পথিকৃৎ তাঁরা হয়ে উঠতে পারবেন কি না তার বিচার হবে মহাকালের দরবারে। ❑